রবীন্দ্রনাথ এবং আমরা

ইবনে সাঈজউদ্দীন

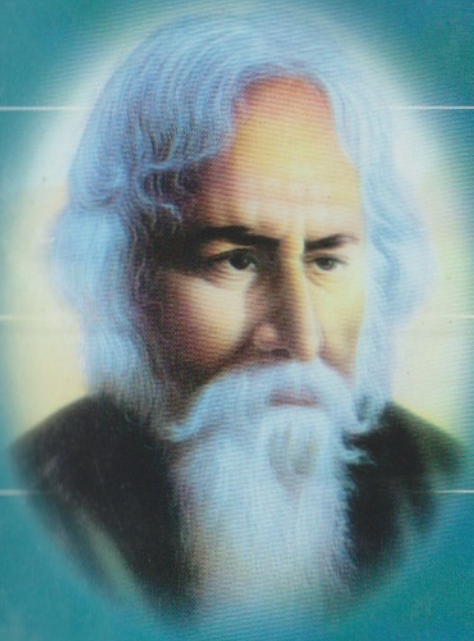

রবীন্দ্রনাথ এবং আমরা

ইবনে সাঈজউদ্দীন

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ঢাকা

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ এবং আমরা

ইবনে সাঈজউদ্দীন

প্রকাশনায়
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

পরিবেশনায়
প্রফেসর'স বুক কর্ণার
মগবাজার, ঢাকা

প্রকাশকাল
একুশে বইমেলা'২০০৩

কম্পোজ
প্রফেসর'স কম্পিউটার, ঢাকা

মুদ্রণে
ক্রিসেন্ট প্রিন্টার্স, ঢাকা

মূল্য
পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN-984-31-1426-0

Rabindronath Abong Amra: *by Ibn Saijuddin,*
Published by Professor's Publications, Moghbazar,
Dhaka-1217, Price- Tk 50.00 only

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সেই সকল বুদ্ধিজীবীকে
একাত্তরে যাঁদের বেছে বেছে
নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

প্রকাশিত

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে শয়তান প্রসংগ

প্রকাশের অপেক্ষায়

হাকিকাতে সালাত বা নামাযের বৈশিষ্ট্য

গণতন্ত্র এক সোনার হরিণ

বিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস

প্রবন্ধ সংকলন (পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ)

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল। রবীন্দ্রসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর সৃষ্টিবৈচিত্র ও বিশালত্বও তুলনাবিরল। বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয় ও নন্দিত। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা, জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাস কোনো ব্যাপারেই রবীন্দ্রনাথের সাথে বাংলাদেশের মানুষের মিল নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ যা নয়, আমরা তাই বলি। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর অন্ধ রবীন্দ্রানুসারী অতি প্রশস্তি আর অন্ধভক্তিতে ও অন্ধ আবেগে রবীন্দ্রনাথকে আকাশচুম্বী করে তুলে ধরার প্রয়াসে লিপ্ত। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তারা সব ধরনের জাতিভেদের উর্ধে মনে করেন এবং তাঁকে অসাম্প্রদায়িক মনে করে মঙ্গলঘট সাজিয়ে আর খোল-করতাল বাজিয়ে পূজা করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে আমরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ইতিহাসের অঙ্গহানী করে সত্য চাপা দেয়ার পক্ষপাতি আমরা নই। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনের ইতিহাসকে তুলে ধরার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এ গ্রন্থ রচনায় যাঁদের লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধ থেকে সরাসরি সাহায্য গ্রহণ করেছি তাঁরা হলেন, সর্বজনাব অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, ডি. এফ. আহমদ, এবনে গোলাম সামাদ, ওবায়দুল হক সরকার, মুহাম্মদ নওশের আলী, গোলাম আহমদ মর্তুজা, মাসুদ খন্দকার, ফিরোজ মাহবুব কামাল, আয়ার দানিশ, আসিফ আরসালান, আমির খসরু, এ.এ. হোসেন মিতুল, সত্যবাদী, খালিদ বিন অলিদ প্রমুখ। আমি এঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

ইবনে সাঈজউদ্দীন
বহরপুর, রাজবাড়ী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ এবং আমরা

বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৭ই মে মোতাবেক ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ মঙ্গলবার কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ পঞ্চানন ঠাকুর তাদের আদিনিবাস যশোর থেকে এসে গোবিন্দপুর গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করেন। কিছুকাল পরেই গোবিন্দপুর, সূতানটি ও কালিঘাট এ তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতা শহর স্থাপিত হয়। পঞ্চাননের পূর্বে এ বংশে কেউ 'ঠাকুর' নামে পরিচিত ছিলো না। তবে পঞ্চানন ঠাকুর ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে জানা যায়। ইংরেজ আমলে তিনি 'ঠাকুর' পদবী লাভ করেন। পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম চব্বিশ পরগনায় আমিনের কাজ করতেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে পিতা-পুত্র উভয়ের ঘনিষ্ঠতা ছিলো। কোম্পানীর ঠিকাদারী করেও তারা প্রচুর অর্থের মালিক হন। জয়রামের দুই পুত্র। দর্পনারায়ণ ঠাকুর ও নীলমনি ঠাকুর। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ ছাড়াও নীলমনি ঠাকুর আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সেরেস্তাদারী করে প্রচুর অর্থোপার্জন করেন।

কলকাতার চিৎপুর রোড তখন কলকাতা শহরের খাসমহল। সময় সম্ভবত ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ। তারই লাগোয়া এই এলাকায় টুকরো জমি কিনে সেখানে একটি আটচালা বানিয়ে বাস করতে এলেন নীলমনি ঠাকুর। সামনে খালের উপর বাঁশের সাঁকো বানালেন লোকালয়ের সাথে সংযোগ রক্ষা করে যাওয়া আসার জন্য। অনুরূপ গিরিশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পাশেই বসতি স্থাপন করে লোকালয়ের সাথে সংযোগ রক্ষা করার জন্য বাঁশের সাঁকো দেন। নাম হয় জোড়াসাঁকো মহল্লা। তারা উভয় পরিবারই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন।

নীলমনি ঠাকুরের ছিলো দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ রামলোচন ঠাকুর এবং কনিষ্ঠ রামমনি ঠাকুর। রামলোচন ঠাকুর ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি ছোট ভাইয়ের অন্যতম সন্তান দ্বারকানাথ ঠাকুর(জন্ম ১৭৯৪)-কে দত্তক নেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ। দ্বারকানাথ ইংরেজী স্কুলে পড়ে ইংরেজী ভাষা ও ফার্সী ভাষা আয়ত্ব করেন। তিনি শিক্ষানুরাগী ছিলেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষ ছিলেন। দ্বারকানাথ

www.pathagar.com

প্রথমে সেরেস্তাদারী পরে দেওয়ান-এর চাকুরী করেন। অতঃপর ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। চাকুরী এবং ব্যবসা উভয়টিতেই তাঁর প্রচুর অর্থাগম হয়। ব্যাংক, কয়লার খনি, লবণ, চিনি, চা ইত্যাদি ব্যবসায় এবং নীল ও রেশম রফতানি করে তাঁর প্রচুর আয় হয়। 'দ্বারকানাথ' নামে যাত্রীবাহী পানিজাহাজ চালু করেন। উপরন্তু তিনি বহরমপুর ও কটকের জমিদারী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজের চেষ্টায় হুগলি, পাবনা, রাজশাহী, মোদিনীপুর, রংপুর ও ত্রিপুরা জেলায় জমিদারী হস্তগত করেন। এ ছাড়াও তিনি তত্ত্ববোধিনী ছাপাখানা, তত্ত্ববোধিনী সমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বেদ-উপনিষদ ইত্যাদি চর্চা ও ধর্মালোচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। ইংরেজদের সাথে তার সম্পর্ক ছিলো খুবই ঘনিষ্ঠ এবং তার এতোসব প্রাপ্তির পেছনে তিনি এ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন।

নীলমনি ঠাকুর নির্মিত জোড়াসাঁকোর আটচালার স্থলে দ্বারাকানাথ ঠাকুর নির্মাণ করেন বিলাতি কায়দায় উঁচু থামওয়ালা শানদার ইমারত। বাড়ীর দক্ষিণ দিকজুড়ে ফুলের বাগান, ছোট বড় গাছপালা মেহেদী গাছে ঘেরা সবুজ চত্বর। দীঘির পানিতে খেলা করছে মায়াবী আলো-ছায়া। ফোয়ারা ছুটে বেরুচেছ পানি। কিশোর-কিশোরীরা বাগানে দোলনায় দুলে সুঘ্রাণ নিচেছ প্রকৃতির আর এগিয়ে যাচেছ পালাবদলের পালা। এই বাড়ীতেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সোনার চামচ মুখে দিয়ে।

১৮৪২ সালের ১৬ই জুন দ্বারকানাথ ঠাকুর বৃটিশ সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দরবারে উপস্থিত হলে তাকে 'প্রিন্স' খেতাবে ভূষিত করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪৬ সালে লন্ডন নগরীতে প্রাণত্যাগ করেন এবং লন্ডনে 'কেনসাস গ্রীণ' গীর্জায় তার শবদেহ সমাহিত হয়। প্রিন্স দ্বারাকানাথ ঠাকুরের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা। তিনি ১৮১৭ সালের ১৫ই মে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার জীবদ্দশাতেই ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর ছাব্বিশ বছর বয়সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ব্রাহ্মধর্ম থেকে তাকে মহর্ষি উপাধীতে ভূষিত করা হয়। ইংরেজ আমলে ইংরেজী ভাষা শিখে, ইংরেজদের শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে অনেক হিন্দু খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মমত হিন্দু ধর্মেরই নতুন সংস্করণ। তবে এতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, বাইবেল ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মিশ্রণ লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের মানস গঠনে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিলো গভীর। ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তার আগ্রহ ছিলো প্রবল। ইংরেজদের দেয়া পদবী, জমিদারী, বিভিন্ন আনুকূল্য লাভের কারণে ঐতিহ্যগতভাবে ঠাকুর পরিবার ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসে। রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার সূত্রে সে

www.pathagar.com

ঐতিহ্যের ধারক। তবে উপনিষদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিলো প্রবল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে ৮৮ বছর বয়সে লোকান্তরিত হন।

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় স্বগৃহে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে বিভিন্ন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। পরবর্তীকালে তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন ওরিয়েন্টাল স্কুল, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী ও সেন্ট ডেভিয়ার্স স্কুলে কিন্তু পড়াশুনা এগিয়ে যেতে পারেনি। কেননা স্কুলের পাঠ্যক্রমে বিতৃষ্ণা ধরে যাওয়ার ফলে বাড়ীতেই তার পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়। সাধারণ স্কুল-কলেজে বেশীদূর লেখাপড়া না করলেও আধুনিক শিক্ষায় তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। বাংলাভাষা তো বটেই, ইংরেজী, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায়ও তার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিলো। স্কুলে বিদ্যাভ্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্যঃ

"নর্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া আমরা বেঙ্গল একাডেমী নামক এক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভর্তি হইলাম।...ইহার ঘরগুলো নির্মম, ইহার দেওয়ালগুলো পাহারা ওয়ালার মতো, ইহার মধ্যে বাড়ীর ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড় বাক্স।...ছেলেদের ভালো-মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিস আছে, বিদ্যালয় হইতে সেই চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত। সেইজন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সংকীর্ণ আঙ্গিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষনাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত। অতএব ইস্কুলের সঙ্গে সে পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না।"

স্কুল-কলেজের বাঁধা-ধরা নিয়ম-শৃংখলা এবং রীতি-নীতি রবীন্দ্রনাথের ধাতে সয় নাই। তিনি ঘরে গৃহশিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহন করেন। তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পারিবারিক পরিবেশও ছিলো শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতিতে অনেক উন্নত। এ পরিবেশের প্রভাবও তার জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারণে যথেষ্ট সহায়ক ছিলো। গৃহশিক্ষক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি এখানে উদ্বৃতিযোগ্যঃ

"মাষ্টার মহাশয়ের আসিবার সময় দু'চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে তবু এখনও বলা যায় না।...রাস্তার সম্মুখে বারান্দাটিতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি।...এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া 'হা হতোহস্মি' করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্যোগে অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে।...তাহার পড়াইবার সময় ছিলো সন্ধ্যাবেলায় এবং পড়াইবার বিষয় ছিল ইংরাজী। সমস্ত দুঃখ দিনের পর সন্ধ্যাবেলায় মিট মিট বাতি জ্বালাইয়া বাঙ্গালী ছেলেকে ইংরাজী পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিষ্ণু দূতের উপরেও দেওয়া হয় তবু তাহাকে যমদূত বলিয়া মনে হইবেই তাহাতে সন্দেহ নাই।"

রবীন্দ্রনাথকে প্রথম লণ্ডনে প্রেরণ করা হয় তার দ্বিতীয় ভ্রাতা তথা প্রথম বাঙ্গালী আই.সি.এস. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে। রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে তিন মাস

www.pathagar.com

ইংরেজী সাহিত্য পড়েন, কিন্তু ভালো লাগেনি বলে দেশে ফিরে আসেন। দ্বিতীয়বার তার সতেরো বছর বয়সে ১৮৭৮ সালে আবার তাকে ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য লণ্ডনে পাঠানো হয়। কিন্তু দেড় বছর পর ফিরে আসেন।

১৮৭৮-৮০ সালে ইংল্যাণ্ড ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ তার চিঠিতে লিখেছিলেন,

"Before I came to England I supposed it was such a small island and its inhabitants were so devoted to higher culture that from one end to the other it would resound with the strains of Tennyson's lyre."

রবীন্দ্রনাথের আট বছর বয়সে কবিতা লেখার প্রবণতা দেখা দেয়। তেরো বছর বয়সে 'অমৃতবাজার' নামে দ্বিভাষিক একটি পত্রিকায় ১৮৭৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী একটি কবিতা ছাপা হয়। যৌবনে পদার্পণ করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর ছাদে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত গান গাইতেন আর বেহালা বাজাতেন। পঞ্চম ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন। ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী তথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতি প্রিয় বৌদি "কাদম্বরী দেবী"। তার খোঁপায় থাকতো জুঁই ফুলের মালা। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসঙ্গীতে সঙ্গত দিতেন ভাতিজা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরবর্তীকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী হয় বিদ্যানিকেতন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার লণ্ডন থেকে ফিরে আসারকালে তার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকো থেকে 'ভারতী" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। রবীন্দ্রনাথ তার অতিপ্রিয় বৌদি কাদম্বরী দেবীর প্রেরণায় এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'কবি কাহিনী' লিখতে থাকেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথের উপর জমিদারীর কাজকর্ম বুঝে নেবার তাকিদ আসে। তখন তার বয়স একুশ বছর। খুলনা জেলার ফুলতলা থানার দক্ষিনডিহী গ্রামের মানুষ বেণীমাধব রায় চৌধুরী জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন। বেণীমাধব প্রভু ও প্রজাবর্গের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন বেনীমাধবের গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে। তরুণ জমিদার কবি আকস্মিক ভাবে আকর্ষিত হলেন বেণীমাধব কন্যা ভবতারিনীর প্রতি। সেই সময় ভবতারিনীর বয়স ছিলো মাত্র এগারো বছর। আলোচ্যকালে হিন্দু সম্প্রদায়ের কিশোরীগণ রজঃশীলা হলেই তাদের বিয়ে দেয়া হতো। ১৮৮২ সালের ৯ই ডিসেম্বর মোতাবেক ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ২৫শে অগ্রহায়ণ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ভবতারিনীর নাম পরিবর্তন করে মৃণালিনী দেবী নামে রবীন্দ্র-মৃণালিনী বিবাহ সম্পন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরালয়ে উঠে যায় দোতলা দালান। কিন্তু এই বিবাহের প্রায় দুই বছর পর ঠাকুরবাড়ীতে এক করুণ তথা নির্মম দুর্ঘটনা ঘটে। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম তথা অতিপ্রিয় বৌদি এবং তার সমবয়সী কাদম্বরী দেবী ১৮৮৪ সালের ১৯শে এপ্রিল

www.pathagar.com

বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। রবীন্দ্রনাথ আজীবন তার মৃত বৌদির শোকছায়া বহন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের প্রায় ছয় বছর পর ১৮৮৮ সালের ২৭শে নভেম্বর রবীন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে। নাম রাখা হয় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর তার শিক্ষা সমস্যা নিয়েই বীরভূম জেলার বোলপুর রেলষ্টেশনের শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সৃষ্টি হয়। এই আশ্রমই পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ১৯০৯ সালে রথীন্দ্রনাথ কৃষি বিজ্ঞানে ডিগ্রী অর্জন করেন। পরের বছর ১৯১০ সালে রথীন্দ্রনাথের বাইশ বছর বয়সে শেবেন্দ্রভূষণ ও বিনোদিনী দেবীর বিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীর সাথে শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষার কবি, বাংলা সাহিত্যের কবি, বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে রীতিমতো বিশ্বকবি। তার সুদীর্ঘ আশি বছরের জীবনে তিনি মোট ৫৬ খানা কাব্যগ্রন্থ, ৪ খানা গীতিকাব্য, ২৯ খানা কাব্যনাট্য, ২,২৩২ টি গান রচনা করেন। এছাড়াও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ১১৯ টি ছোটগল্প, ১২টি ভ্রমণকাহিনী, ৯টি নাটক, বহু সংখ্যক উপন্যাস, বিবিধ প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ইত্যাদি লিখে বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেন। তাঁর লিখিত অসংখ্য পত্রও সাহিত্য পদবাচ্য। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সুবাদে তাকে বিশ্বকবি বলা হয়, যদিও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি যতোটা না প্রতিভার বিচারে হয়, তারচে' অনেক বেশী হয় ভাবাদর্শের বিচারে।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান লিখেছেন ঃ

"যে শক্তিমান কবির কাব্যের ভাব এবং আবেদন বিশ্বজনীন সরলার্থে আমরা তাকেই বিশ্বকবির মর্যাদা দিতে পারি। এই অর্থে দান্তে, হোমার, মিল্টন, শেখ সাদী, জামী, ফেরদৌসী, হাফিয, ওমর খৈয়াম, ইকবাল প্রমুখ বিশ্বখ্যাত কবিদেরকে বিশ্বকবি বলা যায়। কারণ, তাঁদের কাব্যের ভাব ও আবেদন তাঁদের স্বদেশের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বজনীন ও চিরকালীন মানুষের অন্তরে সাড়া জাগায়। কিন্তু তাই বলে তাদের কি 'বিশ্বকবি' এই বিশেষ অবিধা বা বিশেষণে বিশেষিত করা হয়? তা কিন্তু নয়। বিশ্বকবি হিসেবে তাদের কাউকে বিশেষিত করা না হলেও সমগ্র বিশ্বে চিরকালব্যাপী তারা কবি হিসেবে বিশ্বখ্যাত, বিশ্বনন্দিত ও চিরভাস্বর। বিশ্বকবি হিসেবে আমাদের নিকট মাত্র একজন কবিই বিশেষভাবে পরিচিত তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও কবিখ্যাতির কারণে উপরোক্ত যে কোন কবির সাথে তার তুলনা চলে। তার সৃষ্টিবৈচিত্র ও বিশালত্বও তুলনা বিরল। বাংলা সাহিত্যে তিনি এতো অসামান্য অবদান রেখে গেছেন যে, সেজন্য চিরকাল আমরা তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে থাকবো। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথ বেদ-উপনিষদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সনাতন হিন্দু ধর্মকে তার সাহিত্যে তুলে ধরার প্রয়াস

www.pathagar.com

পেয়েছেন, হিন্দু সমাজ ব্যতীত প্রতিবেশী মুসলিম সমাজ সম্পর্কে তাঁর দু'চোখ বন্ধ রেখেছেন, বরং তাঁর সাহিত্যে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করেছেন, তাঁর কাব্যের ভাব ও আবেদন কতোটা বিশ্বজনীন ও সর্বজনগ্রাহ্য সঙ্গত ভাবেই সে সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। স্বাধীনতার স্বপক্ষে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে উপমহাদেশের আপামর জনসাধারণ যখন সোচচার রবীন্দ্রনাথ তখনও ইংরেজ প্রভূদের প্রশস্তি গেয়ে গান-কবিতা রচনা করেছেন, ইংরেজদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, পরাধীনতার জিঞ্জির-মুক্তির কর্মসূচীকে নানা যুক্তির অবতারণা করে প্রত্যাখান করেছেন, সে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জাতীয় আশা-আকাংখার প্রতিফলন কতোটুকু প্রত্যাশা করা যেতে পারে? একটি পরাধীন, অনুন্নত, গরীব দেশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও যে রবীন্দ্র সাহিত্যে দরিদ্র-বুভূক্ষ, নিপীড়িত-নির্যাতিত, কুলি-মজুর, কৃষক, সর্বহারা কোনো মানুষের কথা ফুটে উঠেনি, সে রবীন্দ্র সাহিত্যের আবেদন কিভাবে সর্বজনীন হতে পারে সে প্রশ্ন যথার্থই উত্থাপিত হতে পারে। ইংরেজ শাসকদের আর্শীবাদপুষ্ট জমিদার রবীন্দ্রনাথ চিরকাল শিক্ষিত, উচচ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি থাকতেই সন্তোষ বোধ করেছেন, এহেন রবীন্দ্রনাথের আবেদন সর্ববিস্তারী ও সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া যে সম্ভব নয় তা সহজেই অনুমেয়।

তবু "সোনার পাথরবাটি" প্রবচনে বিশ্বাসী একশ্রেণীর অন্ধ রবীন্দ্রানুসারী তাঁকে বিশ্বকবি বলতে অজ্ঞান। অতি প্রশস্তি ও অন্ধ ভক্তিতে রবীন্দ্রনাথকে তারা আরও কত বিশেষণে যে আখ্যায়িত করে থাকেন, এমনকি অন্ধ আবেগে অন্যদেরকে অহেতুক তুচছ জ্ঞান করে হলেও রবীন্দ্রনাথকে আকাশচুম্বী করে তুলে ধরার প্রাণান্তকর প্রয়াসে লিপ্ত। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সাহিত্য-বিচারে অন্ধভক্তি ও আবেগসর্বস্বতার কোনো দাম নেই। সাহিত্য-বিচারের একটি কালনিরপেক্ষ, যুক্তি নির্ভর, সনাতন পন্থা রয়েছে। সে বিচারে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে এক বিরল প্রতিভার অধিকারী বিশ্বখ্যাত, চির অমর কবি হিসেবে অবলীলায় স্বীকৃতি প্রাপ্ত। কিন্তু ঐ বিশ্বকবির আরোপিত অভিধাটুকু কতটা তার ব্যাপারে মানানসই সে প্রশ্ন সঙ্গত ভাবেই থেকে যায়। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর কোন বড় কবি বা শিল্পীই সমালোচনার ঊর্ধে নয়, রবীন্দ্রনাথকে যারা এর ব্যতিক্রম মনে করেন, তাদের রবীন্দ্র ভক্তি প্রশ্নাতীত হলেও তাদের কাণ্ডজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে সহজেই প্রশ্ন তোলা যায়।

নোবেল পুরস্কার সারা বিশ্বে সর্বাধিক সম্মানজনক ও বিপুল অঙ্কের পুরস্কার। তবে এ পুরস্কার সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত তা বলা যাবে না। সারা বিশ্বের বাছাইকৃত সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিরাই যে শুধু এ পুরস্কার পেয়ে থাকেন তা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। পুরস্কার দাতাদের ইচছা, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী এর পেছনে একান্তভাবে ক্রিয়াশীল। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথসহ ডজনাধিক কবি-সাহিত্যিক এ পুরস্কার

www.pathagar.com

পাওয়ার যোগ্য হলেও একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কাউকে এ যাবতকাল এ পুরস্কারের জন্য বিবেচনায় আনা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই এ পুরস্কারের জন্য একজন অতি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু শুধু সেই যোগ্যতার বলেই কি তাকে এ পুরস্কার দেয়া হয়? পুরস্কারের পেছনে যে রাজনৈতিক বুদ্ধি ও গোষ্ঠী স্বার্থ কাজ করে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা এমন হুবহু মিলে যায় যে, অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও অনেকের মনে তা স্বভাবতই জাগতে পারে। বংশানুক্রমিকভাবে রবীন্দ্রনাথ এমন এক পরিবারের সদস্য যে পরিবারটি ছিলো সর্বদা সর্বাংশে ইংরেজ রাজশক্তির সাথে সখ্যতা সম্পর্কে আবদ্ধ। এ সখ্যতার কারণেই একটি বহিরাগত পরিবার (রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষ নীলমনি ঠাকুর ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোতে এসে বসতি স্থাপন করেন) ধীরে ধীরে বিত্ত-বৈভব, জমিদারী, প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজ সম্রাজ্ঞী কর্তৃক "প্রিন্স" খেতাবে ভূষিত হন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুরও "মহারাজ" খেতাব পান। রবীন্দ্রনাথ নিজেও "নাইট" উপাধী লাভ করেন। ইংরেজদের সাথে তো সখ্যতা ছিলোই, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডে তিনি কখনও জড়িত ছিলেন না। এহেন একজন রাজানুগত বিখ্যাত ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা পাশ্চাত্যের দায়িত্ব ছিলো বৈ কি। পুরস্কার পাওয়ার বছর দুয়েক আগে মুসলমানদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য সারা ভারতের হিন্দুরা যখন তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে তখন তাদেরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সম্রাট দিল্লী আগমন করেন। দিল্লীতে হিন্দুরা তাঁর জন্য এক বিরাট সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে। সে সভার উদ্বোধনী সঙ্গীত ছিলো রবীন্দ্রনাথ রচিত "জয় জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা" এই গান। সেই সভায়ই বঙ্গভঙ্গ রদের আবেদন জানানো হয় এবং সম্রাট তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করেন। সর্বান্তঃকরণে সম্রাটের বন্দনাগীতি গেয়ে ভারত ভাগ্য বিধাতা হিসেবে পঞ্চমুখে তার জয়গান গাইলে সম্রাটের সুপ্রসন্ন না হয়ে কি উপায় আছে?

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার বহুপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড ও পাশ্চাত্যের বহু দেশ পরিভ্রমণ করে পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন-যাত্রা সম্পর্কে উচ্ছসিত প্রশংসা করে লেখালেখি ও বক্তৃতা করেন। পুরস্কার প্রাপ্তির কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বারের মতো ইংল্যান্ড সফরে যান। বিখ্যাত ইংরেজ কবি ডবলিউ বি ইয়েটস্-এর সঙ্গে তখন তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। ইয়েটস্ সে সময় তাঁকে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। সে সুবাদে ইংল্যান্ডের প্রভাবশালী পত্রিকা "দি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট", "ফাইনেন্সিয়াল টাইমস", "দি ডেইলি টেলিগ্রাফ" প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বেশ লেখালেখি হয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির প্রস্তাবকদের মধ্যে ইয়েটস

www.pathagar.com

ছিলেন অন্যতম এবং তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট লবিং করেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের জন্য পুরস্কার পাওয়াটা অনেকটা সহজ হয়। অন্য কোন বাঙ্গালী কবি-সাহিত্যিকদের তো এ ধরণের কোন পটভূমি ছিলো না বা এখনো নেই। ফলে প্রতিভা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের কারো ভাগ্যে এ পুরস্কার জোটেনি। যেভাবেই হোক, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন অবশ্যই তাঁর যোগ্যতার বলে। এর দ্বারা বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালী জাতি হিসেবে আমরা অবশ্যই গৌরব বোধ করছি। তবে শুধু যোগ্যতাই সব সময় সব কিছুর মাপকাঠি নয়, এখানে এ কথাটার উপরই গুরুত্ব দেয়া আমার উদ্দেশ্য।"

[বিশ্বকবি, নোবেল পুরস্কার ঃ জাতীয় কবি ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমানঃ দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ২২ শে মে ১৯৯৮]

প্রশাসনিক সুবিধার্থে এবং পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত পূর্ববঙ্গ ও আসামের উন্নতিকল্পে প্রধানত মুসলমানদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ বিভক্ত হয়। ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। ফলে মুসলিম প্রধান নতুন প্রদেশের উন্নতি অগ্রগতির নতুন সম্ভাবনাময় দিগন্ত উম্মোচিত হয়েছিলো। বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা প্রাদেশিক রাজধাণীর মর্যাদা লাভ করে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে এই নতুন প্রদেশের মুসলমানদের যথেষ্ট উন্নতি অগ্রগতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকা নিয়ে একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হোক কিংবা ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি বৃহৎ ভূ-ভাগে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হোক এটা কোনো হিন্দুরই অভিপ্রেত ছিলো না। ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের, এমন কি তার নতুন রাজধানী ঢাকার হিন্দুবর্গ সর্বভারতীয় হিন্দু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন ও তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। কলকাতায় তারা বঙ্গভঙ্গ রদের দাবীতে যে সভা করেন তাতে সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ সময় তিনি অবিভক্ত বাংলার লক্ষ্যে গানও রচনা করেন। গানগুলি নিম্নরূপঃ

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পূণ্য হউক, পূণ্য হউক, পূণ্য হউক, হে ভগবান।।

... ...

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরের যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।।"

... ...

"আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি।।"

... ...

www.pathagar.com

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।।"
ইত্যাদি ইত্যাদি।

এভাবে বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠির স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যুক্ত বাংলার পক্ষে তিনি অসংখ্য গান-কবিতা রচনা করেন তাঁর সহযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করতে। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার আড়ালে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি তথা আজকের বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছিলেন। অবশেষে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী হিন্দুদের আন্দোলন ও দাবীর ফলে ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ১৯১১ সালে ভারত সফরে এলে দিল্লীতে হিন্দুরা তাঁকে বিপুল সংবর্ধণা প্রদানের ব্যবস্থা করে। সে সভা শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ রচিত উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে। ইংল্যাণ্ড সম্রাটের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সে গানের কয়েকটি লাইন ঃ

"জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ

... ...

স্নেহময়ী তুমি মাতা তব চরণে নত মাথা
জয় হে জয় হে জয় হে জয় জয় জয় জয় হে।"

সর্বান্তকরণে সম্রাটের বন্দনাগীতি গেয়ে "ভারত ভাগ্যবিধাতা" হিসেবে পঞ্চমুখে তার জয়গান গাইলে সম্রাটের সুপ্রসন্ন না হয়ে কি উপায় আছে? সে সভাতেই বঙ্গভঙ্গ রদের আবেদন জানানো হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লী দরবার থেকে স্বয়ং বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করলেন ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর।

যাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী সংস্কৃতির গুরু সেই গুরু মহাশয় ইংরেজদের কিভাবে পদচুম্বন করেছেন দেখুন। এখানে ইংল্যাণ্ডের রাজার বন্দনা ও প্রশস্তি রয়েছে। "ভারতের ভাগ্যবিধাতা" বলে তার প্রতি গভীর আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়েছে। ভারতের অখণ্ডত্বের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার কোনো কথা সেখানে নেই। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই গানটিই পরে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। যাই হোক, ঐরূপ প্রশস্তিমূলক এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনমুলক গান গেয়ে বক্তারা এক এক করে সকলেই বঙ্গভঙ্গ রদ করার আবেদন জানালেন। অভিভূত সম্রাট সাথে সাথে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দিয়ে অনুন্নত ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশাল জনপদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার জলাঞ্জলি দিয়ে প্রভাবশালী হিন্দুদেরকে খুশী করলেন।

এককালে বাংলাদেশকে শোষণ করার হাতিয়ার ছিলো কলকাতায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর ১৯১২ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী মর্যাদা লাভ করে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলা (বাংলাদেশ) ও আসাম নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশের মুসলমানদের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু দাদাবাবুদের চাপে ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লীর দরবারে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' ঘোষনা করতে বাধ্য হন। মুসলমানরা আবারও হিন্দুদের 'সেবাদাস' হয়ে পড়ে।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিবাদে নবাব সলিমুল্লাহ বৃটিশ সরকারের প্রদত্ত "নাইট" উপাধী বর্জন করেন। এ উপাধী বর্জনে এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন ইংরেজ রাজ। পূর্ব বাংলার অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ৩১শে জানুয়ারী ঢাকায় আসেন। নবাব সলিমুল্লাহ, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ বড়লাটের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী পেশ করেন। পূর্ব বাংলার বঞ্চিত মুসলমানদের সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে এ দাবী মেনে নেয়া হয়। ১৯১২ সালের ৪ঠা এপ্রিল ভারতীয় বৃটিশ সরকার চূড়ান্তভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং ২৭শে মে তারিখে বাংলা সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি (নাথন কমিটি নামে খ্যাত) নিয়োগ করেন। মি. রিচার্ডনাথন ও সিডিএস ফ্রেজার যথাক্রমে কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১২ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটিতে আরো ২ জন ইংরেজসহ ৪ জন হিন্দু ও ৪ জন মুসলমান ছিলেন। ৪ জন হিন্দু সদস্য থাকা সত্ত্বেও কলকাতার হিন্দু নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতায় নেমে পড়েন। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলায় বঞ্চিত অবহেলিত মুসলমানদের স্বার্থে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ খন্ড রিপোর্টের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, "হিন্দুদের পরিচালিত সংবাদপত্র, হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অসংখ্য প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন এবং সভার সিদ্ধান্তগুলো প্রেরণ করতে থাকেন বৃটিশ সরকারের কাছে। শীর্ষস্থানীয় হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ১৮ বার স্মারকলিপি পেশ করা হয় বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে। বড় লাটের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে তারা এই বলে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ অধিকাংশই কৃষক, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে তাদের কোন উপকার হবে না।" *[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট, ৬ষ্ঠ খন্ড]*। এসব প্রতিবাদ সভায় কলকাতার হিন্দুদের পাশাপাশি বাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দও অংশ নেন। এদের পুরোভাগে ছিলেন শ্রীহট্টের বিপিনচন্দ্র পাল, কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বর্ধমানের রাসবিহারী ঘোষ, কলকাতার আশুতোষ মুখার্জী, গুরুদাস ব্যানার্জী, এমনকি রবীন্দ্রনাথ নিজে পর্যন্ত। তারা ঢাকা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়কে মক্কা এবং ফক্কা (অন্তঃসারশূন্য) বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি আশুতোষ মুখার্জী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠান। ১৯১২ সালের ২৮শে মার্চ কলকাতায় গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে হিন্দুদের যে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় তার সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বঙ্গভঙ্গের তথা মুসলিম স্বার্থের বিরোধিতা করলেন 'আমার সোনার বাংলা' গান লিখে আর বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মুসলমানেরা যে বিশ্ববিদ্যালয় পেতে যাচ্ছিলো তার প্রতিবাদ করলেন প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করার মাধ্যমে। অবশেষে ১৯২১ সালের ১লা জুলাই ঢাকার রমনা এলাকায় ৬ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব বাংলার মুসলমানদের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই জানে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস।

বংশানুক্রমিক রবীন্দ্রপরিবার হিন্দু সেন আমল, মুসলিম আমল ও ইংরেজ আমল সকল যুগেই রাজানুগত ছিলেন এবং সর্বদা রাজানুগ্রহ ভোগ করে এসেছেন। জমিদার ও ব্যবসায়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সর্বদা রাজানুগত ছিলেন। স্বাধীনতার স্বপক্ষে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে উপমহাদেশের জনসাধারণ যখন সোচচার রবীন্দ্রনাথ তখনো ইংরেজ রাজশক্তির প্রশস্তি গেয়ে গান-কবিতা রচনা করেছেন। ইংরেজদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, পরাধীনতার জিঞ্জির মুক্তির কর্মসূচীকে নানা যুক্তির অবতারণা করে প্রত্যাখ্যান করেছেন, সে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জাতীয় আশা আকাংখার প্রতিফলন প্রত্যাশা করা নিতান্তই অবান্তর।

এ প্রসংগে ড. আহমদ শরীফ বলেন,

"শাসক ইংরেজের প্রতি তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) ছিল অপরিমেয় অনুরাগ ও গভীর আস্থা আর নিবিড় শ্রদ্ধা। তাঁর রাজনীতিবিমুখতা, দেশে স্বশাসন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অনাগ্রহভাব, স্বাধীনতা আন্দোলনে নিরুৎসাহ প্রভৃতির কারণও জমিদার কবির এই ইংরেজপ্রীতি। রবীন্দ্রনাথ বৃটিশের সুশাসন ও সুপোষনেরই প্রত্যাশী ছিলেন।"

(আহমদ শরীফঃ রবীন্দ্র উত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়নঃ ত্রৈমাসিক উত্তরাধিকার, বৈশাখ- আষাঢ় ১৩৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা)

এ প্রসঙ্গে এবনে গোলাম সামাদ বলেন,

"রবীন্দ্রনাথের যে উপন্যাসটি ইংরেজ আমলে সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়েছিল, তার নাম 'চার অধ্যায়'। ইংরেজ সরকার এই উপন্যাস কিনে জেলে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য আটকে রাখা বন্দীদের পড়তে দিত। এতে রবীন্দ্রনাথ সে সময়ের সশস্ত্র বিপ্লবীদের জীবনকে অত্যন্ত খাটো করে এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথের বৃটিশ

www.pathagar.com

বিরোধী আন্দোলনে কোন ভূমিকা ছিল না। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বইটি যখন বেআইনী হয়, তখন তিনি কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তিনজন কবি ইংরেজ আমলে বৃটিশ বিরোধী কবিতা লিখে জেল খেটেছেন ঃ হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং কাজী নজরুল ইসলাম। অবশ্য বলছি না জেল খাটলেই লোকে দেশপ্রেমিক হয়। রবীন্দ্রনাথ তার গীতাঞ্জলীতে ইংরেজকেও বলেছেন, স্যার অভিষেকে সূচিকার মত সবার হাত ধরতে। উপনিষদের ভিত্তিতে মহাজাতি গড়ে তুলতে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনেক কবিতা লিখেছেন যাতে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ উৎসাহ পায়। কিন্তু ববীন্দ্রনাথের এমন কোন কবিতা নেই।

[ড. এবনে গোলাম সামাদঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে বাম, ডান এবং অন্য রাজাকারঃ দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯]

অতএব সঙ্গতভাবেই এ প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে, যিনি জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় ভাবধারা ও আশা-আকাংখার বিরোধী, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ধ্বজাধারী তিনি বিশ্বকবির শিরোপা কিভাবে পেতে পারেন? রবীন্দ্রচর্চার নামে যারা রবীন্দ্রপূজা করে থাকেন উপর্যুক্ত মন্তব্য তাদের বিবেককে কিছুটা হলেও নাড়া দেবে বলে আশা করি।

মহান রবীন্দ্রনাথের দূর্নাম করার উদ্দেশ্য আমাদের নয়। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলে আমরা জেনে ও মেনে তৃপ্তিবোধ করি, তাঁর প্রতিভাকে আমরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসের অঙ্গহানি করে সত্য চাপা দেবার পক্ষপাতি আমরা হতে চাই না। কবিকে সম্মান করার অর্থ এই নয় যে, তাঁর জীবনের ইতিহাসকে চেপে দিতে হবে, সত্যের অপলাপ করতে হবে। আমরা যদি সত্যকে চেপেই যাই তাহলে পৃথিবীর অন্যান্য লেখক তাদের কলমকে কি থামিয়ে রাখবেন? 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা' বিশাল ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। কিন্তু এটা রচিত হয়েছিল স্বাধীনতার পূর্বে (১৯১২)। তাছাড়া ইংরেজদের ভারত ছাড়ার পূর্বেই কবির মৃত্যু হয়। আসলে অত্যাচারী ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি পঞ্চম জর্জ যখন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট তখন কবির লেখা এ কবিতায় পঞ্চম জর্জকে "ভারতের ভাগ্যবিধাতা" বলে উল্লেখ করে সেটা উপহার দেয়া হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতায় পঞ্চম জর্জকেই স্বাগত জানানো হয়েছিলো এবং তারই স্তুতি করা হয়েছিলো বলে ভারতীয় জনসাধারণ এবং রাজনৈতিক মহলে তখন খুব ঝড় উঠেছিলো। ইংরেজদের চলে যাবার পরও এনিয়ে কম তোলপাড় হয়নি। ষাটের দশকে আসামে এবং নব্বইয়ের দশকে কেরলে বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরা কবিতার উদ্দেশ্য ও সারবস্তু নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলেছেন। (দৈনিক আজকাল পত্রিকা, ৩০.৪.১৯৯২)। পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিবাদ উঠেছে বলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা গেছে। আমরা নানা বাধা বা দ্বিধায় এসব যদি নাই

www.pathagar.com

প্রকাশ করি তাহলে আর কি কেউ এসব তথ্য প্রকাশ করবেন না? চট্টগ্রামে ১৯৭৫-তে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই বের হয়েছে যেটার নাম *'ভুলে যাওয়া ইতিহাস'*। সেই পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠায় এ মূল্যবান তথ্য মুদ্রিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ *'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'* গানটি লিখেছিলেন বঙ্গভঙ্গ রদ করার উদ্দেশ্যে। বঙ্গভঙ্গের ফলে বঙ্গ সংস্কৃতির ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে বলে হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য যে আন্দোলন পরিচালনা করে রবীন্দ্রনাথ তার অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন। কিন্তু এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আরো যে সব প্রেরণা কাজ করেছিলো সে সম্পর্কে বাম আন্দোলনের নেতা কমরেড মুজাফফর আহমদ বলেন,

"পূর্ববঙ্গের বড় বড় জমিদার বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। আন্দোলন জোরদার হওয়ার এটাও একটা কারণ ছিলো। জমিদাররা ভয় পেয়েছিলেন যে, মুসলিম কৃষক-প্রজাপ্রধান পূর্ববঙ্গে না জমিদারী প্রথা বিলোপ হয়ে যায়।"

[মুজাফফর আহমদঃ আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ঢাকা সংস্করন, ১৯৭৭, পৃঃ ৭]

উপর্যুক্ত মন্তব্য সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে এবনে গোলাম সামাদ বলেন,

"অন্য জায়গার কথা জানি না। নওগাঁ জেলার কালিগ্রাম পরগণায় ছিলো রবীন্দ্রনাথের বিরাট জমিদারী। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সেটা হারানোর ভয় পেয়েছিলেন। মুজাফফর আহমদ একেবারে বাজে কথা লিখেছেন বলে ভাবার কারণ নেই। এই 'সোনার বাংলা' গানের মূলে লুকিয়ে ছিলো অত্যাচারী রবীন্দ্রনাথের জমিদারী রক্ষার বিশেষ অভিপ্রায়। এই জমিদারী রবীন্দ্রনাথকে যুগিয়েছে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর খরচ। রবীন্দ্রনাথ তার কালিগ্রাম পরগণার সদর কাচারী পতিসরে কৃষি ব্যংক স্থাপন করেছিলেন। তিনি কলকাতার ব্যাংক থেকে ৮ টাকা সুদে টাকা ধার নিয়ে পতিসরে কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে তা কৃষকদের ধার দিতেন ১২ টাকা সুদে। রবীন্দ্রনাথ তার নোবেল পুরস্কারের ১,০৮,০০০ টাকা এই কৃষি ব্যাংকে জমা রাখেন শান্তিনিকেতনের নামে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় এবং পরে বিশ্বভারতী এই ব্যাংক থেকে সুদ হিসেবে প্রতিবছর পেতো ৮ হাজার টাকা। সে সময় ৮ হাজার টাকা যথেষ্ট টাকা। রবীন্দ্রনাথ পতিসরে যে হাইস্কুল করেন, তার জন্য তিনি কৃষক প্রতি টাকায় তিন পয়সা করে বাড়তি কর বসান। রবীন্দ্রনাথ পরে এই কৃষি ব্যাংক তুলে নিতে বাধ্য হন। কারণ আইন হয়, কৃষকের কাছ থেকে কৃষিঋণ প্রদান করে এতো চড়া হারে সুদ গ্রহণ চলবে না বলে। রবীন্দ্রনাথ এক একবার জমিদারীতে এসে প্রচুর নজরানা গ্রহণ করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই দিকটি নিয়ে আলোচনা হয়নি আজও।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের গফুর নামে একজন মুসলমান বাবুর্চি ছিলো। তার রান্না মাংসসহ রবীন্দ্রনাথ প্রচুর বিলাতী মদিরা পান করেছেন পতিসরে বসে, এই রকমই শোনা যায়। *(দৈনিক ইনকিলাব, ৬ই সেপ্টম্বর ১৯৯৯) (পূর্বোক্ত)*

১৯১১ সালে বৃটিশ সম্রাটের প্রশস্তি গেয়ে যে গান রচনা করেছিলেন, সে গানটি পরবর্তীতে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। কারণ তাতে অখণ্ড ভারতের জয়গানও গাওয়া হয়েছে। অপরপক্ষে, মুসলিম স্বার্থবিরোধী বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যে 'সোনার বাংলা' গান রচিত হয়েছিলো, কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা না করেই একটি বিশেষ মহল সেই গানটিকেই স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত করেন। অথচ ভৌগলিক দিক থেকে এবং আমাদের আদর্শ-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি এর কোনো দিক থেকেই ঐ গানটি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ প্রসঙ্গে এবনে গোলাম সামাদ মন্তব্য করেন,

"রবীন্দ্রসাহিত্য পড়ে যারা আনন্দ পেতে চান, তারা তা পেতে পারেন। কিন্তু আমি রবীন্দ্রনাথের গানকে জাতীয় সঙ্গীত করার বিরোধী। কারণ রবীন্দ্রনাথের সাথে আমাদের জাতীয় চেতনার কোনো ঐতিহ্যগত যোগসূত্র নেই। আজকের বাংলাদেশ মূলতঃ বাংলাভাষী মুসলমানদের সংগ্রামের ফল। আর এর আছে একটা পৃথক ইতিহাসের ধারা। তাছাড়া আজকের বাংলাদেশ আর রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' এক ব্যঞ্জনা বহন করে না। *(পূর্বোক্ত)*

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যারা সব ধরনের জাতিভেদের ঊর্ধে মনে করেন এবং যারা তাকে অসাম্প্রদায়িক মনে করে হিন্দুয়ানী কায়দায় মঙ্গলঘট সাজিয়ে আর খোল-করতাল বাজিয়ে পূজা করে চলেছেন (কবি বেগম সুফিয়া কামাল তো মূফতীয়ে আযম সেজে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়াকে ইবাদত মনে করে গোটা জাতিকে সেই ইবাদতে(?) সামিল হওয়ার ফতোয়া দিয়ে দিয়েছেন) তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচনের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করছি। আজন্ম বিলাসিতায় মগ্ন রবিবাবু মুসলমানদের কি চোখে দেখতেন তার নমুনা দেখুন তাঁর বন্দীবীর কবিতায় কিছু অংশেঃ

"মোঘল শিখের রণে মরণ আলিংগনে,
কণ্ঠে পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে,
দংশনক্ষত শ্যান বিহংগ যুঝে ভূজংগ সনে,
সেদিন কঠিন রণে।
'জয় গুরুজীর' হাঁকে শিখবীর সুগভীর নিঃস্বনে
মত্ত-মোঘল-রক্ত-পাগল 'দীন দীন' গরজনে।"

রবীন্দ্র পূজারীদের আরাধ্য দেবতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শিখেরা অমিত তেজী বীর। আর মুসলমানেরা 'মত্ত-মোঘল-রক্ত-পাগল।' অথচ ঐ শিখদের

www.pathagar.com

বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই তাদের ও তাদের সহযোগীদের হাতে ১৮৩২ সালে বালাকোটের ময়দানে সাঈয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ) এবং শাহ ইসমাঈল (রহঃ) কে অত্যন্ত নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিলো। এই মহান ব্যক্তিদ্বয় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কানে আসে শিখদের চিৎকার "জয় গুরুজী" আর মুসলমানদের 'গরজন' তার কানে আসে "দীন দীন"। মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম ধারণাও আছে তারা অবশ্যই মুসলমানদের প্রাণের ধ্বনি "আল্লাহু আকবর"-এর সাথে পরিচিত। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, মুসলমানেরা যে কোনো মিছিল শোভাযাত্রাতেও একমাত্র "আল্লাহু আকবর" ধ্বনিই দিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "দীন দীন" নয়।

রবীন্দ্রনাথের হোরিখেলা কবিতাটি দেখুন ঃ

"পত্র দিল পাঠান কেশর খাঁরে/ কেতুন হতে ভুনাগ রাজার রাণী
লড়াই করি আশ মিটেছে মিয়া? / বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া,
এসো তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া / হোরি খেলবো আমরা রাজপুতানী।
যুদ্ধে হারি কোঠা শহর ছাড়ি/ কেতুন হতে পত্র দিল রাণী।
পত্র পড়ি কেশর ওঠে হাসি/ মনের সুখে গোঁফে দিল চাড়া।
রঙিন দেখে পাগড়ি পড়ে মাথে/ সুরমা আঁকি দিল আঁখির পাতে
গন্ধ ভরা রুমাল নিল হাতে/ সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া
পাঠান সাথে হোরি খেলার রাণী/কেশর হাসি গোঁফে দিল চাড়া।'

এ জাতীয় অনেক কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের প্রাণভরে বিদ্রূপ করেছেন। সাম্প্রদায়িক মানসিকতা নিয়ে ভুনাথের রাণীকে দিয়ে পাঠান কেশর খাঁর কাছে প্রেমপত্র পাঠিয়েছেন, আর পাঠান সেনাপতি কেশর খাঁ যুদ্ধনীতির যাবতীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা পরিহার করে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে হিন্দু নারীর যৌবনে উম্মাদ হয়ে হোরি খেলতে চলে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এটাই বুঝিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান সৈন্যের আগমন বার্তা শুনলে যাদের রাজা মহারাজা পর্যন্ত প্রাণের ভয়ে সাপের ঝুড়ির মধ্যে সেঁধিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে তারা এভাবেই পত্র-পত্রিকায় কবিতা সাহিত্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করা ছাড়া আর কীইবা করতে পারেন!

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিবাজী উৎসব' কবিতা দেখুন-
"কোন দূর শতাব্দীর কোন এক অখ্যাত দিবসে/ নাহি জানি আমি,
মারাঠার কোন শৈলে অরণ্যে অন্ধকারে বসে /হে রাজা শিবাজী,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রবাহে/ এসেছিল নামি,
এক ধর্মরাজ্য পাশে শত ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত/ বেঁধে দিব আমি।

www.pathagar.com

তারপর একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে / তব বজ্রশিখা,
আঁকি দিল দিক-দিগন্তে যুগান্তরে বিদ্যুৎ বহ্নিতে/মহামন্ত্র লিখা।
মোঘল উষ্ণীষ শীর্ষে প্রস্ফুরিল প্রলয় প্রদোষে/পক্বপত্র যথা,
সেদিনও শোনেনি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্র নির্ঘোষে/কি ছিল বারতা।
...আমি কবি এ পূর্ব ভারতে/ কি অপূর্ব হেরি,
বঙ্গের অঙ্গন দ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হতে/তব জয়ভেরি।
তারপর শূন্য হল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে/ দিল্লীর রাজশালা,
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে/ দীপালোক মালা।
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে উপহাস/ অটুট হাস্য রবে,
তব পূণ্য চেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস/এই জানে সবে।
শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হতে এল নামি/করিল আহবান,
মুহূর্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল হে স্বামী/ বাঙালীর প্রাণ।
শবলুব্ধ গৃধ্রদর উর্ধস্বর বীভৎস চিৎকারে/মোঘল মহিমা,
রচিল শ্মশান শয্যা মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে / হল তার সীমা।
তোমারে চিনেছি আজি চিনেছি যে রাজন/ তুমি মহারাজ,
তব রাজকর লয়ে আট কোটি বঙ্গের নন্দন/ দাঁড়াইবে আজ।
সেদিন শুনিনি কথা, আজ মোরা তোমার আদেশ/শির পাতি লব,
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ/ ধ্যানে মন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন/ দরিদ্রের বল,
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন/ করিব সম্বল।
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালী, এক কণ্ঠে বলো/ 'জয়তু শিবাজী"
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালী এক সঙ্গে চলো/ মহোৎসবে আজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিমে পূরব/ দক্ষিন ও বামে,
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব/ এ পূণ্য নামে।"

মারাঠা দস্যুরা এদেশে বর্গী নামে পরিচিত। *"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কিসে"*- এই ছড়ার সাথে মারাঠি বর্গীদের অত্যাচারের কাহিনী ইতিহাসে আজও বিভীষিকার মতো বিদ্যমান। যে শিবাজীর বর্গী অর্থাৎ লন্ঠনকারী দুর্বৃত্তদল লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারীহরণ করে বাংলাকে ছারখার করে দিয়োছিলো, যে শিবাজী হিন্দু গুণ্ডা-পাণ্ডাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে এবং মুসলমানদের উপর বহু অবর্ণনীয় নির্যাতন করে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় লুণ্ঠনকারী ও মনুষ্যহত্যাকারী দস্যুতে পরিণত হয়, সেই শিবাজী-পূজারীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবস্থান ছিলো প্রথম সারিতে।

www.pathagar.com

শিবাজী সম্পর্কে ঐতিহাসিক স্যুলিভান লিখেছেন,

"শিবাজী ছিলেন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় লুণ্ঠনকারী ও মনুষ্যহত্যাকারী দস্যু। তিনি যাদের সংগঠিত করেছিলেন, সেই মারাঠিগণ এমন অপরাধপ্রবণ ছিলো যে, মুহূর্তের মধ্যে তারা তাদের লাঙ্গলের ফলাকে তরবারিতে রূপান্তরিত করে এবং ঘোড়া ধার কিংবা চুরি করে লুটতরাজ অগ্নিসংযোগ অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তো। এ ব্যাপারে তারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতো না। মারাঠিগণ হিন্দু হলেও অবৈধ পন্থায় ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য তারা অবাধে হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস, গো-হত্যা, হিন্দু-ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের হত্যা করতো। যেখানেই তারা গেছে, সেখানেই তারা ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞের চিহ্ন রেখে গেছে।"

এই ছিলো শিবাজী, আর এই ছিলো তার মারাঠি বাহিনী। এই মারাঠি দস্যুরাজ শিবাজী ছিলো সম্রাট আওরঙ্গজেবের ঘোর শত্রু। মোঘল বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে টিকতে না পেরে শিবাজী কূটকৌশল করে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়।. শিবাজীর চক্রান্ত না বুঝে সেনাপতি আফজল খান প্রতাপগড়ের পাহাড়ে শিবাজীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মুসলমানসুলভ উদারতায় দুহাত বাড়িয়ে দেন। চরম বিশ্বাসঘাতক শিবাজী আস্তিনে লুকিয়ে রাখা 'ব্যাঘ্রনখ' নামক অস্ত্র মুসলিম সেনাপতির বুকে ঢুকিয়ে অত্যন্ত পৈশাচিকভাবে তাকে হত্যা করে। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বীরের কলঙ্ক, বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ, লুটেরা ও তস্কর ছত্রপতি শিবাজী হলো জাতীয় বীর। কারণ, শিবাজী ভারতে ইসলাম ও মুসলমানমুক্ত করে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথ তো "এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে" অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ঘোষনাই করেছেন, "মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালী এক কণ্ঠে বলো "জয়তু শিবাজী" এরপরও রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদী! অহিংস!! অসাম্প্রদায়িক!!!

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গের সকল সন্তানকে "জয়তু শিবাজী" গাহনের আহবান জানালেন। তাতে যে বঙ্গের মুসলমানগন সাড়া দিতে পারে না। সে বোধটি তিনি তখন হয়তো হারিয়ে ফেলেছিলেন। এর কারণ হলো বঙ্গের মুসলমানদের তিনি "হিন্দু মুসলমান" মনে করতেন। এই হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশ ভাগের আগে এদেশের মুসলমানদের হিন্দু করার মানসে "হিন্দু মুসলমান" থিওরী প্রবর্তন করেছিলেন ।

উপমহাদেশের স্বনামধন্য সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন রবীন্দ্রনাথের "হিন্দু মুসলমান থিওরী" সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"বস্তুত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মুসলমানদের আপত্তিকর তথা হিন্দুদের পরিপোষক বিষয়সমূহ চালু করে বুঝাবার এই চেষ্টা চলেছিল যে, এ সবই হলো বাঙালী ও ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য। কাজেই হিন্দুদের মতো মুসলমানদেরও এসবে আপত্তি করবার কিছু নেই। কিছু সংখ্যক

www.pathagar.com

তরলমতি তরুণদের মনে এ প্রচারণার প্রভাব পড়ে নাই এ কথা বলতে পারি না। তাছাড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষী তো এ প্রকার উক্তি করতে দ্বিধা করেন নাই যে, মুসলমান ধর্মে ইসলামানুসারী হলেও জাতিতে তারা হিন্দু। কাজেই তারা হিন্দু মুসলমান। বাঙলার শিক্ষাক্ষেত্রে এই হিন্দুমুসলমান সৃষ্টির চেষ্টাই অব্যাহত গতিতে শুরু হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে। মুসলমান তরুণদের একশ্রেণী এ প্রচারণায় এতটা প্রভাবিত হয়েছিলো যে এদেরই গুরুস্থানীয় জনৈক চিন্তাশীল মুসলমান অধ্যাপক (কাজী আবদুল ওদুদ) এক প্রবন্ধে নির্দ্বিধায় লিখেই ফেলেছিলেন যে, 'এ দেশী মুসলমানরা হচেছ হিন্দু মুসলমান।'

(আবুল কালাম শামসুদ্দীন ঃ অতীত দিনের স্মৃতি ঃ ঢাকা, পৃ- ১৭৮-১৭৯)

মুসলমানদের উপর বাঙালীত্বের নামে হিন্দুত্ব চাপিয়ে দেয়ার পরিণাম কিন্তু শুভ হয় নাই।

বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ অন্নদাশংকর রায় লিখেছেন,

"হিন্দুদের বিকাশ হবে হিন্দুত্বের ভিতর দিয়ে, বাঙালীর বিকাশ হবে বাঙালিত্বের ভিতর দিয়ে। বেশ তাহলে মুসলমানের বিকাশ হবে কিসের ভিতর দিয়ে? সে যে হিন্দু নয় সেটা তো সুস্পষ্ট। কিন্তু সেও তো বাঙালী। তার বাঙালীত্ব কি একটু স্বতন্ত্র নয়? অবিকল হিন্দু ধাঁচের? বাঙালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে গেলে সে তো প্রতিবাদ করবেই। সে তো বলবেই, 'আমরা বাঙালী নই, আমরা মুসলমান'। কথাটা আমি যেমন মুসলমানের মুখে শুনেছি, তেমনি হিন্দুর মুখেও শুনেছি, 'ওরা মুসলমান আমরা বাঙালী।' এটা আমাদেরই স্বখাত দলিল। ইংরেজের কাটা খাল নয়, খালটা বাড়তে বাড়তে পদ্মানদীর চেয়েও প্রশস্ত ও গভীর হয়েছে।"

(অন্নদাশংকর রায়ঃ প্রবন্ধ সংগ্রহঃ তৃতীয় খন্ডঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ ৩৬৩-৩৬৪) ।

ইংরেজদের কাটা খাল নয়। রবীন্দ্রনাথের কাটা খাল।

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "মুসলমান জাতিতে হিন্দু।" একদল মুসলমান বিশ্বাস করলো তারা হিন্দু মুসলমান। রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীও এরূপ উক্তি করতে দ্বিধা করেন নাই যে, মুসলমানরা ধর্মে ইসলামানুসারী হলেও জাতিতে তারা হিন্দু। কাজেই তারা "হিন্দু মুসলমান"। সত্য বলতে কি, হিন্দুর মধ্যে মুসলমানকে 'লীন' করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর "হিন্দু মুসলমান" থিওরী প্রবর্তন করলেন।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আবুল মুনসুর আহমদ লিখেছেন,

"হাজার বছর মুসলমানরা হিন্দুর সাথে এক দেশে একত্রে বাস করিয়াছে। হিন্দুদের রাজা হিসেবেও, হিন্দুদের প্রজা হিসেবেও। কিন্তু কোন অবস্থাতেই হিন্দু মুসলমানে সামজিক ঐক্য হয় নাই। হয় নাই এই জন্য যে, হিন্দুরা চাহিত আর্য,

www.pathagar.com

অনার্য, শক, হুন যেইভাবে 'মহাসাগরের সাগর তীরে লীন' হইয়াছিল, মুসলমানেরাও তেমনি মহান হিন্দু সমাজে লীন হইয়া যাউক। তাদের শুধু ভারতের মুসলমান থাকিলে চলিবে না, হিন্দু মুসলমান হইতে হইবে। এইটা শুধু কংগ্রেসী বা হিন্দু সভার মত ছিল না। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথেরও মত ছিল।"

[আবুল মুনসুর আহমদ ঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর। ঢাকা, পৃ ১৫৮-১৫৯]

পাশ্চাত্যের প্রতি মোহমুগ্ধতা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তা খুব সুখকর নয়। এ প্রসংগে অধ্যাপক মতিউর রহমান তাঁর 'পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লিখেছেনঃ

"১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলী কাব্যের ইংরেজী অনুবাদের জন্য নোবেল পুরস্কার পান।...নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে পাশ্চাত্যের যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে জোর তদবির করেছিলেন প্রখ্যাত ইংরেজ কবি **W.B. Yeats** তাদের অন্যতম। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৩৫ সালে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখেন ঃ *Damn Togore. We got out three good books... and then, because he thought it more important to see and know English than to be a great poet, he brougtht out sentimental rubbish and wrecked his reputation. Tagore dose not know English, no Indian knows English. Nobody can write with music and style in a language not learned in childhood and ever since the language of his thought.*

কবি ইয়েটস-এর কথায় অবশ্যই কিছুটা বাড়াবাড়ি আছে। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে একজন বড় কবি ছিলেন। তা ছাড়া যদিও রবীন্দ্রনাথ একবার ইংরেজী শেখার জন্য এবং দ্বিতীয়বার ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন কিন্তু কোনটাই শেষ করতে পারেননি, তবু তিনি ইংরেজী জানতেন না, এ কথাটির মধ্যে অবশ্যই অতিশয়োক্তি রয়েছে। তবে, ইংরেজদের মতো ইংরেজীতে চিন্তা-কল্পনার স্ফুরণ ঘটানো অ-ইংরেজদের পক্ষে সেটা দুষ্কর বৈকি! মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের মতো কালজয়ী প্রতিভার পক্ষেও সেটা সম্ভব হয়নি, এটা তো আমরা শিক্ষিত মাত্রেই অবগত।

পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট দার্শনিক ও নাট্যকার বার্ণার্ডশ, যিনি তার একটি নাটকে একটি চরিত্রের নামকরণ করেন স্টুপেন্দ্রনাথ বেগর *(Stupendranath Begore)*, রসিকতাচ্ছলে একবার বলেন, *Old bluebread, how many wives has he got. I wonder!*

পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল একবার এক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার পর লেখেন, *It was unmitigated rubbish, cut and*

www.pathagar.com

dried conventional stuff about the river becomeing one with Brahma... The man is sincere and is earnest, but merely ratting old dry bones.

বার্ট্রাণ্ড রাসেল অন্য আর একবার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখেন, *His talk about the infinite is vague nonsense. The sort of language that is admired by many Indians unfortunately does not, in fact, mean anything at all.*

বৃটিশ পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেসব আলোচনা ছাপা হয় সেগুলোও অত্যন্ত নৈরাশ্যকর। 'সানডে টাইমস'-এ হামফ্রে কারপেন্টার লিখিত একটি রিভিউ-এর শিরোনাম ছিলো Mystic or mistake. হামফ্রের মতে, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত নন। কারণ তার কবিতার বৈশিষ্ট্য হামফ্রের ভাষায়, *Gooey, Vaguely erotic pantyeism.* হামফ্রের মতে, রবীন্দ্রনাথ এক বিজ্ঞ অভিনেতার ভূমিকা পালন করেন। পাশ্চাত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে হামফ্রে বলেন, *Tagore did for yeats what Maharishi (yogi) was to do for the Beatles.*

"দি টাইম" পত্রিকায় "The wisest fool in calcutta" শিরোনামে P.N Furbank রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখেন, *"The authors use the words 'myriad minded' and 'colossus' about him, but those do not seem right, and belong to the unreal role Europe thrust upon him. One can hardly claim that in any serious sense, Tagore was a thinker at all."*

"দি অবজারভার" রিভিউ কলামে রবীন্দ্রনাথকে *'One of the most interesting cult figures of the 20th century'* এদাবীকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়।

এই পত্রিকাগুলোতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে সব কটুক্তি ও বিরূপ সমালোচনা করা হয় তার ফলে পাশ্চাত্যে বিশেষত ইংল্যান্ডে রবীন্দ্রনাথেব ভাব-মূর্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হয়।"

[পশ্চাত্যের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমানঃ দৈনিক সংগ্রাম, ৯ই মে ১৯৯৭]

অবিভক্ত বাংলার ভদ্র সমাজে নাচের প্রচলন ছিলো না। রবীন্দ্রনাথ এর প্রচলন করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্যা শ্রীমতি মৈত্রেয়ী দেবী তার 'ন হন্যতে' গ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠায় এ দাবী করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

"১৯২৬ কিংবা ১৯২৮ সালে শিলং গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে মনিপুরী লোকনৃত্য দেখে রবীন্দ্রনাথই প্রথম রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের সামনে ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের নৃত্য প্রবর্তন করলেন। দর্শকেরা টিকেট করে সে নাচ দেখতে গেল।

www.pathagar.com

বাঙালী ঘরের মেয়ে সহস্র লোকের সামনে অঙ্গ সঞ্চালন করবে এ কথা চিন্তা করে অনেকেরই রাত্রির নিদ্রা চলে গিয়েছিল। এ এক রকম বিদ্রোহ ঘোষণা। হয়তো রাজনৈতিক বিপ্লবের চেয়েও কঠিনতর। রবীন্দ্রনাথকে তাই সাবধানে চলতে হয়েছিল। প্রথম যে নাটকে এই নৃত্য জলসা হলো সে 'নটীর পূজা'। কথা ও কাহিনীর শ্রীমতি কবিতাটিকেই এ নাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। 'নটীর পূজা' অর্থাৎ নৃত্যটাও নৃত্যশিল্পীর জন্য পূজোই এই বিশেষ ব্যঞ্জনার দ্বারা নটীর কলঙ্কমোচন করা হয়েছিল খুব সুক্ষ্মভাবে। যে গানটির সাথে নৃত্য করলো শ্রীমতি নামে যে দাসী, সে হচ্ছে 'আমায় ক্ষম হে ক্ষম...' নর্তকী ভগবান বুদ্ধকে বলছে, 'তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে' কিংবা 'আমার সব চেতনা সব বেদনা রচিল এসে কি আরাধনা...' সেই আরাধনার ভাবমূর্তি দেখে নিন্দুকেরা কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। আমি 'নটীর পূজা' দেখিনি। কারন নাচ দেখবার তখন আমার বয়স হয়নি।"

রবীন্দ্রযুগে ভদ্র সমাজে নাচের প্রচলন ছিলো না। নাচ একমাত্র নিষিদ্ধ পল্লীতে সীমাবদ্ধ ছিলো। বেশ্যারা নৃত্য-কলার মাধ্যমে খদ্দের আকৃষ্ট করতো। দেহব্যবসায় দেহ বল্লরীর মাদকতা মূল কথা। এই ব্যবসায় কামোদ্দীপক নাচে যে যতো বেশী চৌকস তার ততো বেশী দাম। সুন্দরী না হলেও সুন্দর নাচের দ্বারা বেশ্যারা বাজার মাত করতো। নৃত্য কামোত্তেজনা বৃদ্ধির একটি অমোঘ অস্ত্র। রবীন্দ্রনাথ ভদ্র সমাজে নাচের আমদানি করলেন। শ্রীমতি মৈত্রেয়ী দেবী যথার্থই বলেছেনঃ "এ এক রকম বিদ্রোহ ঘোষণা। হয়তো রাজনৈতিক বিপ্লবের চেয়েও কঠিনতর। রবীন্দ্রনাথকে তাই সাবধানে চলতে হয়েছিল।" তবু সমালোচনার ঝড় উঠেছিলো। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় "কাব্যে নীতি" শীর্ষক এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

'রবীন্দ্রবাবুর "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যটি লউন। এটি রবীন্দ্রবাবুর ভক্তদের বড় প্রিয় কিনা? তাই চিত্রাঙ্গদাই লইলাম। মহাভারতে বর্ণিত চিত্রাঙ্গদার গল্পটি এই-'অর্জুন মনিপুর রাজ্যে ভ্রাম্যমানা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং চিত্রাঙ্গদার পিতার সম্মতি লইয়া তাহাকে বিবাহ করেন।'

এই গল্পটি রবীন্দ্রবাবুর বড়ই গদ্যময় বোধ হইল।...রবীন্দ্রবাবু কোটপিনের অবতারণা করিলেন। হউক না অস্বাভাবিক, নতুন রকম তো হইল। 'ডুববে না হয় ডুববে-একটা নতুন হবে খুব'। কোর্ট শিপ না হলে প্রেম হয়। রবীন্দ্রবাবুর কাব্যের গল্পাংশ এই-

বনমধ্যে অর্জুনকে দেখিয়া উপযাচিকা হইয়া কুরূপা চিত্রাঙ্গদা তাহাকে আত্মসমর্পণ করেন। অর্জুন তখন সম্মত হয়েন। অর্জুন সেই অনূঢ়া কন্যাকে বর্ষাকালে ভোগ করেন। তাহার পরে তাহাদের (বোধহয়) বিবাহ হয়। অদ্ভুত

www.pathagar.com

কোর্টশিপ। এ কোর্টশিপে একজন সামান্য ইংরেজ নারী সম্মত হইতো না। কিন্তু তাহা একজন হিন্দু রাজকন্যা যাচিয়া লইলেন। চমৎকার!

রবীন্দ্রবাবু অর্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, দেখুন। একজন যে কোনও ভদ্রসন্তান এরূপ করিলে তাহাকে আমরা একাসনে বসিতে দিতে চাহিতাম না। অর্জুন একজন কুমারীর ধর্ম নষ্ট করিলেন। একটু ইতস্তত করিলেন না। মনে একটু দ্বিধা হইল না। বর্ষাকাল ধরিয়া একটি ভদ্রমহিলাকে সম্ভোগ করিলেন। আর তিনি যে সে ব্যক্তি নহেন, তিনি অর্জুন-যিনি বেশ্যাসক্তিও অনুচিত বিবেচনা করেন। তিনি রবীন্দ্রবাবুর হাতে পড়িয়া অনায়সে একটি রাজকন্যার সর্বনাশ করিলেন।

আর চিত্রাঙ্গদা! বেচারী মা আমার! বঙ্গের কবিবরের হাতে পড়িয়া তোমার এহেন দুর্গতি হইবে, তাহা বোধ হয় তুমি স্বপ্নেও ভাবো নাই। একজন যে সে হিন্দু কুলবধু যে অবস্থায় প্রাণ দিত কিন্তু ধর্ম দিত না, সেই অবস্থা তুমি উপযাচিকা হইয়া গ্রহণ করিলে। আর কি বলিব-বর্ষাকাল, দ্বিধা নাই, সংকোচ নাই, ধর্ম নাই-কেবল নিত্য ভোগ আর ভোগ, আর নিলর্জ্জভাবে তাহার বর্ণনা আর রূপটি নিজেরে নহে বলিয়া আত্মগ্লানি। দুঃখ তাহা নহে যে, 'কল্য রাত্রিকালে কি করিলাম।' দুঃখ এইমাত্র 'হায়, আমি স্বয়ং যদি সুরূপা হইতাম তাহা হইলে আরও উপভোগ করিতাম।' বর্ষাকালের ভিতর কি তাহার পরেও ব্যাভিচারিণীর এক দিনের জন্যও অনুতাপ হইল না।

তাহাই বুঝি যে, এই কাব্য দূর্নীতিমূলক হউক, ইহা মনুষ্য স্বভাবের একখানি ছবি। তাহাও নহে। এ চিত্র অস্বাভাবিক। লজ্জা, সংকোচ, সম্ভ্রম সব দেশেই নারী জাতির সম্পত্তি, একজন কুলাঙ্গারকে এরূপ নির্লজ্জা কুলটা করিতে হইলে একটা আয়োজন চাই। রবিবাবু এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের কোন আয়োজন দেখান নাই।

রবীন্দ্রবাবুর গ্রহ-উপগ্রহগণ ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অশ্লীল কবি বলেন। আর রবিবাবুকে Chaste কবি বলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র যাহাই করুন, তিনি বিদ্যার যে ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দাম্পত্য প্রেমের সম্ভোগ indecent কিন্তু immoral নয়। রবীন্দ্রবাবুর চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগ অভিসারিকার সম্ভোগ। হিন্দু সমাজে কেন, পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজে এ চিত্রাঙ্গদা মুখ দেখাইতে পারিত না।

অশ্লীলতা ঘৃণ্য বটে, কিন্তু 'অধর্ম' ভয়ানক। ঘরে ঘরে 'বিদ্যা' হইলে সংসার আস্তাকুঁড়ে হয়; কিন্তু ঘরে ঘরে চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্নে যায়। সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কুনীতি অপরিহার্য। আর রবীন্দ্রবাবু এই কাজকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমনি বঙ্গদেশে আর কোন কবি অদ্যাবধি করেন নাই। সেজন্য এই সুনীতি আরও ভয়ানক।

www.pathagar.com

আমি 'চিত্রাঙ্গদা'র সমালোচনা করিতে বসি নাই। ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্ধ, ইহার উপমাচ্ছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধহয় কেউই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।"

[দিজেন্দ্রলাল রায় ঃ কাব্যে নীতি ঃ সাহিত্য ঃ ২০ বর্ষ ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬]

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'চিত্রাঙ্গদা' সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দিলেন-"তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।" আশ্চর্য, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এই পুস্তকখানি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বোধহয় বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ যৌনাচারে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে তা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি দুর্দান্ত ফিচার ছাপা হয়েছে কলকাতার 'আনন্দবাজার' পত্রিকায়। ফিচারটির শিরোনাম 'রবীন্দ্র মাফিয়া'। গত ২৭ শে মে'৯৫ শনিবার আনন্দবাজারের ফিচার পাতায় ১ ও ২ নম্বর পৃষ্ঠায় আট কলাম জুড়ে প্রকাশিত হয়েছে এই নিবন্ধটি। ফিচারটির লেখক "রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়"। রঞ্জনবাবু ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দারুণ সব মন্তব্য করেছেন কলকাতার হাল আমলের দুই শীর্ষ কথাশিল্পী। এরা হলেন, "সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়" এবং "শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়"। আরো একজনও মন্তব্য করেছেন। তিনি হলেন "আবুল বাসার"। এদের মন্তব্য পড়লে ভিরমি খেতে হয়। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রভক্তবৃন্দ এবং বিশ্বভারতী সম্পর্কে এরা যেসব দুঃসাহসিক উক্তি করেছেন, সেসব উক্তি যদি বাংলাদেশে করা হতো, তাহলে এতোদিনে তার বাপ-মা চৌদ্দগোষ্ঠীকে তুলো ধূনো করা হতো।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত জনপ্রিয় কথাশিল্পী। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস এ পর্যন্ত আড়াইশ'টি। শুধু ভারতীয় বাংলাতেই নয়, বাংলাদেশেও তাঁর অনেক পাঠক আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং রবীন্দ্র ভক্তির আতিশয্য সম্পর্কে ২৭ শে মে'৯৫ আনন্দবাজার প্রকাশিত সুনীল বাবুর মন্তব্য ঃ

"রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন, সেটা এখন ক্রমশই হুজুগ হয়ে উঠেছে। এ যুগের ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে চায় না। কোন আগ্রহ নেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি। এটা হয়েছে কিন্তু তাঁদের দূরদৃষ্টির অভাবে, যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের সম্পত্তি ভেবে মৌরুসিপাট্টা জারি করলেন। এটা এক ধরনের জবরদস্তিও বলতে পার। বিশ্বভারতীও তার মধ্যে আছে।"

বাংলাদেশে যদি কেউ বলে যে, রবীন্দ্র জন্মদিবস পালন এখন একটা হজুগের ব্যাপার, অথবা এ যুগের ছেলে-মেয়েরা রবীন্দ্রসংগীত শুনতে চায় না অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রতি এ যুগের ছেলে-মেয়েদের কোনো আগ্রহ নেই। তখন বাংলাদেশের সুনীলভক্ত এবং আনন্দবাজারীরা কি রেগে-মেগে তেড়ে মেরে ডাণ্ডা

www.pathagar.com

দিয়ে ঠাণ্ডা করতে আসবেন না? বাংলাদেশেও কি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মৌরুসিপাট্টা জারি করা হয়নি?

রবীন্দ্রভক্তির আতিশয্য সম্পর্কে এরপর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "রবীন্দ্রনাথকে গুটি হিসেবে চেলে যাঁরা বানিজ্যে চেকমেট করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন এক একটা দাদা বা দিদির আণ্ডারে রবীন্দ্র গায়ক গোষ্ঠি। দাদা-দিদিরা প্রায় প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে ডাকেন। এবং যিনি যতবার গুরুদেব বলতে পারেন 'রবীন্দ্রবান' হিসেবে তার তত শুদ্ধতা জোর।" এরপর তিনি বলেছেনঃ

"রবীন্দ্রপক্ষ এলে তো কথাই নেই। রবীন্দ্রনাথ তখন সত্যিই এদের প্রপার্টি। গুরুদেবের গান গাইতে গাইতে এ শাটল কর্কের মতো ছুটে বেড়ান অনুষ্ঠান থেকে অনুষ্ঠানে। পুরোহিত যেমন দেবতার পূজো দিয়ে চালকলা বেঁধে প্রণামী নিয়ে বাড়ি যান, রবীন্দ্রশিল্পীরাও অনেকটা কবিপক্ষে সেই রকম।"

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই অংশের সাথে বাংলাদেশের অবস্থাটা মিলিয়ে দেখুন। বাংলাদেশেও রবীন্দ্রনাথকে "গুরুদেব" বলে ডাকা শুরু হয়েছে। এখানেও কি রবীন্দ্রপক্ষ এলে রবীন্দ্রশিল্পীরা শাটল কর্কের মতো ছুটো-ছুটি করেন না? রবীন্দ্রভক্তি এখন দেবতার চরণে নৈবেদ্য অর্পণের মতোই দেখা যায়। তাইতো আজ বাংলাদেশে অনেকে রবীন্দ্রনাথের অতিভক্তদের ঠাট্টা করে রবীন্দ্রপূজারী বলে থাকেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই মৌরুসিপাট্টা জারি করার আদিখ্যেতায় অতীষ্ঠ হয়ে অতঃপর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেনঃ

"রবীন্দ্রসঙ্গীত মডার্ণ জেনারেশনের কাছে বোরিং। একই সুর। কোনও রকমফের নেই। বড্ড স্লো। আধুনিক জীবনের গতির সঙ্গে যায় না। এ যুগের ছেলে-মেয়েরা যখন বড় হবে, এখন যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বিশুদ্ধ রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচেছন, তাঁদের প্রভাব যখন কমে আসবে, তখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই হুজুগ আর থাকবে না।"

এখন ঢাকা-চিটাগাং বা বাংলাদেশের কোনো শহরে কোনো অনুষ্ঠানে কোনো বক্তা যদি বলেন যে, আধুনিক প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রসংগীত বড় বোরিং, বড্ড স্লো, আধুনিক জীবনের গতির সঙ্গে খাপ খায় না, তাহলে তার কপালে কি জুটবে? রবীন্দ্রপূজারীরা কি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলবেন না যে, ওরা গেঁয়ো ভূত, আনকালচার্ড ভূত? তবে অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, এতোসব দূর্দান্ত কথা ওপার বাংলার সুনীল বাবু বললেন আর এপার বাংলার রবীন্দ্রপুজারীরা খামোশ মেরে গেলেন। এটা কিভাবে সম্ভব? কিন্তু কি করবেন তাঁরা? তাঁরাতো বড় অসহায়। কারণ আনন্দবাজারী প্রসাদ না পেলে ওঁরা তো কুলীন হতে পারবেন না।

কালচার আর আনকালচারের কথা যখন উঠলোই তখন ওপার বাংলার রবীন্দ্র কালচারের কি বেহাল দশা এটা একবার দেখুন। রবীন্দ্রকালচার নাকি এখন

www.pathagar.com

টেবিলের তলায়। এ কথাটিও কিন্তু আনন্দবাজারের। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট নিয়ে কলকাতায় যে খেলা চলছে, সে সম্পর্কে মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন আনন্দবাজার। এ সম্পর্কে 'রবীন্দ্রমাফিয়া' নিবন্ধে রঞ্জন বন্দোপাধ্যায় লিখেছেনঃ

"গান গাইতে শিখেই শিল্পীরা কোনও বিখ্যাত দাদা বা দিদির স্নেহধন্য হয়ে পেয়ে যাচ্ছেন তাঁদের কণ্ঠ নিঃসৃত রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট-আগ্রহী আউটলেট। বাজার ছেয়ে গেছে এই সব সেলফ-হেলপ ক্যাসেটে। অর্থাৎ শিল্পীরা নিজেরাই টাকা খরচ করে ক্যাসেট বানাচ্ছেন। পুরো ব্যাপারটার বানিজ্য মানে লেনদেন ঘটে টেবিলের তলায়। রবীন্দ্র কালচার আণ্ডার দ্যা টেবল। প্লিজ আমার নামে আবার কোট বানাবেন না। তাহলে আপনি যাদের রবীন্দ্র মাফিয়া বলছেন, তারা আমায় শেষ করে দেবে।"

কলকাতার আরেকজন বিখ্যাত কথাশিল্পী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শীর্ষেন্দু বাবুর মন্তব্য শুনলে আনেকেরই পিলে চমকে উঠবে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

"কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাও আমি সমর্থন করি না।"

তিনি লিখেছেন ঃ

"কে বলেছিলো তাকে বিশ্বকবি হতে? বিশ্বকবি কথাটারই তো কোন মানে নেই। কিন্তু তবু তাকে তথাকথিত বিশ্বকবি হিসেবে খাড়া করে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। এর জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই দায়ী। দেশে বিদেশে ঘুরে তিনি রাষ্টদূত, রাষ্ট্রপ্রধান, নানারকম সেলিব্রেটিদের সাথে বন্ধুত্ব করে, দেখা করে কেন এত সব কাণ্ড করতে গেলেন? শুধুমাত্র কবিতা লিখলেই তো যথেষ্ট হতো। এখন তাকে বিশ্বকবি হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব যেন আমাদের।"

এই ধরনের কথা যদি বাংলাদেশ থেকে বলা হতো তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াতো? যাঁরা বলতেন তাঁদের কপালে কি কি অবিধা জুটতো? প্রথমেই তিনি হয়ে যেতেন "পাকিস্তানের দালাল"। তারপর তাকে বলা হতো "বাঙালীর শত্রু"। অতপর তিনি হতেন "স্বাধীনতার বিরোধী" এবং "সাম্প্রদায়িক"। আমরা বললেই যতো দোষ। আর ওদের বেলা সাত খুন মাফ। এ যেনো সেই "দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ হয়েছে আমার বেলা।"

কলাকাতার আরেকজন নামকরা সাহিত্যিক আবুল বাসার । চিন্তাধারায় নাকি তিনি বামপন্থী। সেই আবুল বাসারের মতে রবীন্দ্রনাথের চারিদিকে সৃষ্টি করা হয়েছে একটি দূর্ভেদ্য বলয়। রবীন্দ্রপূজারীরা তাঁর মতে রবীন্দ্রমাফিয়া। আবুল বাসার লিখেছেন ঃ

"না, মাফিয়া কথাটায় আমার কোন আপত্তি নেই। এই তথাকথিত রবীন্দ্রভক্তরাই তৈরী করেছেন সুরক্ষিত রবীন্দ্র বলয়। লক্ষণের গণ্ডীর মতো।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ আর কার্ল মার্ক্সের মধ্যে কোন তফাত নেই। কমিউনিষ্টরা যেমন মার্ক্সকে এক্সপ্লয়েট করেছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রভক্তরা। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই এক্সপ্লয়টেশন। বিশেষ করে মেয়েদের যেন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেই হবে, না হলে বিয়ে হবে না। এ রকম একটা ব্যাপার মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরে চলছে। কি ভয়ংকর! কারণে- অকারণে হবু বরের বাবা দেখতে এলেই মেয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে 'অমল ধবল পালে লেগেছে' গাইছে। এর চেয়ে করুণ আর কি হতে পারে? কেন গাইছে? কারণ তার বাড়ীর একটা কালচার আছে। সে ভাল বাড়ীর মেয়ে, এইটে প্রমাণ করার জন্য। এই সর্বব্যাপী রবীন্দ্র নির্ভরতা কিন্তু একটা জাতির স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। অনেক বাবা-মা ভাবেন এই সব সঙ্গীত নিলয়ে গীতাঞ্জলীর তালিম নিলে তাদের বালিকাটি অচিরেই বিয়ের বাজারে সিউর শট হয়ে দাঁড়াবে। কালচার-ভালচাররা ছোঁ মারার জন্য তৈরী।"

আবুল বাসারের উক্তির সাথে বাংলাদেশের রবীন্দ্রপুজারীদের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় কি না মিলিয়ে দেখুন। রঞ্জন ব্যানার্জি বা আবুল বাসারের মতো 'রবীন্দ্র মাফিয়া' বা এই ধরণের কোনো কড়া কথা ব্যবহার করতে চাই না। তবে বাংলাদেশ টেলিভিশনকে যারা মৌরুসিপাট্টা করেছে তারা কি টেলিভিশনে একটি বিষুবরেখা আঁকে নাই? ঐ বিষুবরেখার একই সমতলে 'ধর্মনিরপেক্ষ', 'প্রগতিশীল', 'অসাম্প্রদায়িক', 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' ইত্যাদি সাজানো হয়েছে। এসব পরিভাষার সোল এজেন্ট একাধিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দল এবং একাধিক জীবিত বা মৃত নেতা। স্বাধীনতা বা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কটাক্ষ না করা সত্ত্বেও ঐ বিষুবরেখায় অবস্থানকারী দলগুলো তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কয়েকটি পেটেন্ট শব্দ ব্যবহার করেন।

এগুলো হলো, 'স্বাধীনতা বিরোধী'', 'মৌলবাদী'', 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'সাম্প্রদায়িক', 'পাকিস্তানের দালাল' এবং 'রাজাকার'। কিন্তু যে সুনীল শীর্ষেন্দু এবং রঞ্জন-বাসাররা এসব কঠোর উক্তি করেছেন তাদের দিকে ঐ সব বিশেষণ ছুঁড়ে দেয়া হয় না কেন?

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাথে যে নৃত্য পরিবেশন করা হয়, সেটা কোন জাতের নাচ? প্রশ্নটা কলকাতার। আর এ প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নাচ, শুধু রবীন্দ্রনাথের নামে চলছে। তারা হাত-পা নিয়ে কি যে করবে তাই বুঝতে পারে না। তাদের হাতের ইঙ্গিত থেকে মনে হয়, তারা ইধারকা মাল উধার করছেন ক্রমাগত।"

রবীন্দ্র সঙ্গীতের সাথে নাচ সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে মন্তব্য করলেন, যে সম্পর্কে আমাদের নৃত্য শিল্পীরা কি বলেন? রবীন্দ্র সাহিত্য, রবীন্দ্র কালচার এবং

www.pathagar.com

রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে যাদেরকে দিকপাল হিসেবে প্রচার করা হয় সুনীল বাবুর উপরোক্ত মন্তব্য সম্পর্কে তাদেরই বা প্রতিক্রিয়া কি?

সুনীল-শীর্ষেন্দু-বাসারদের মতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের এখন বেহাল অবস্থা! রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চলছে এখন বেনিয়াসুলভ কর্মকাণ্ড। রবীন্দ্র সঙ্গীতের আবেদন যাচ্ছে কমে। কেমন করে রবীন্দ্র সঙ্গীত তথা রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে আবেদনময় করা যায়, সেটারও পথ বাতলিয়েছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় কথাশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। রবীন্দ্র সঙ্গীতকে তিনি মডার্ণাইজ করতে চান। করে ব্যান্ড সঙ্গীত বানাতে চায়। এ সম্পর্কে মাফিয়া শীর্ষক ফিচারে তিনি লিখেছেনঃ

"আমি খুব খুশী হব সেদিন হোটেলের নৃত্য শিল্পীরা ছোট ছোট স্কার্ট পরে রবীন্দ্রনাথের গান নিজেদের সুরে গেয়ে নাচবে। কেউ তাকে ছ্যা ছ্যা করে অপসংস্কৃতির ধিক্কার দেবে না। কুমার শানুর মতো পপুলার শিল্পী যদি নিজের মতো করে রবীন্দ্রনাথের গান করেন তাহলেই রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন থাকবে। অনেক বাড়বেও। মহম্মদ রফি যদি গজলের ঢঙে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন? কিংবা কুমার শানু যদি কোনও বাংলা ছবিতে বাপ্পি লাহেড়ির সুরে মিঠুনের ঠোঁটে নিজের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা বসিয়ে দেন তাহলে?"

বাংলাদেশে রবীন্দ্রভক্তি পূজার পর্যায়ে চলে গেছে। হিন্দু ধর্মে দেবতা বা অবতারদের সম্পর্কে কটাক্ষপাতকে রীতিমতো পাপ বলে গণ্য করা হয়। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। বাংলাদেশের রবীন্দ্র পূজারীরা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মকে ঠিক ঐ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এখানেও মানুষ রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্র কর্মকে অবতার জ্ঞান করে তার বিন্দুমাত্র সমালোচনাকে পাপরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্রকর্ম তো পরের কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চরিত্র নিয়েই কথা উঠেছে। এ সম্পর্কে 'রবীন্দ্র মাফিয়া' নিবন্ধে আনন্দবাজারের মন্তব্যঃ

"রবীন্দ্রনাথের সাথে কি শ্রীমতি ওকাম্পোর দৈহিক সম্পর্ক হয়েছিল? রবীন্দ্রনাথকে কেনই বা বিশ্ব কবি বলা হবে? রবীন্দ্রনাথের ইংরেজীকে এবং তার কবিতার আধুনিক আবেগ প্রবণতাকে ইয়েটস কি যথার্থভাবেই গালাগালি দেননি? বার্ণার্ড শ'র নাটকে ষ্টুপেন্দ্রনাথ কি রবীন্দ্রনাথ?"

এরপর আর কি কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন আছে? বার্ণার্ড শ' এবং ইয়েটসের মতো বিশ্ববিখ্যাত কবি সাহিত্যিকেরা যখন রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিশুদ্ধি নিয়ে কটাক্ষ করেন বা গালিগালাজ করেন তখন কোনো দোষ হয় না। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করলেও সেখানে কোনো ঘাট হয় না। রবীন্দ্রনাথের পরকীয়া সম্পর্ক নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও এরা খাড়া চোখ নিয়ে কথা বলতে পারেন না। যতো দোষ সব নন্দ ঘোষ। রবীন্দ্রপূজারীরা বাংলাদেশে শুধু দুরাত্মা আর পাপাত্মা খুঁজে বেড়ায়।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদেরকে নিয়ে লেখেননি, সেকথা বললেও ভ্রষ্টাচারী হতে হয়। অথচ কলকাতাতে সাত খুন মাফ। হায়রে কলকাতা!

(আসিফ আরসালানঃ দৈনিক সংগ্রাম; ঢাকা, ২৯শে জুন ১৯৯৫)

কলকাতা থেকে প্রকাশিত শারদীয় 'দেশ' ১৪০৫ সংখ্যায় 'তপোবন বিদ্যালয়' সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেনঃ

"১৯০১ সালের ডিসেম্বরে শান্তি নিকেতন ব্রাহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। নাম থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য এবং প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ এবং এই বিদ্যালয়ের চরিত্র সহজেই আন্দাজ করে নেয়া যায়। আদর্শ হলো প্রাচীন ভারতের তপোবন, শিক্ষকেরা গুরু, ছাত্ররা ঋষিকুমার। তপোবন যে ঐতিহাসিক সত্য শুধু অতীতের নয়, চিরকালের সত্য, এ আদর্শ যে কালাতিক্রান্ত নয় অবিলম্বে এ কালের জীর্ণ ভারতবর্ষকে উদ্ভিন্ন করে এক মহাজীবনের আবির্ভাব হবে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। তপোবন বিদ্যালয়ের কাঠামো যে সর্বভারতীয় হওয়া সম্ভব নয়, বাস্তব পরিস্থিতিতে সম্ভব নয় তা রবীন্দ্রনাথের মনে হয়নি। অন্ততঃ তখন মনে হয়নি। ভারতীয়ত্ব আর হিন্দুত্বকে সেদিন তিনি অল্পবিস্তর গুলিয়ে ফেলেছিলেন। পরে অনেক পরে তপোবনের ঐতিহাসিক সত্যতার বিষয়ে তিনি নিজেই গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আপাতত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাই বলি।

নিয়মাবলীতে বলা হলো, "ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তি শ্রদ্ধাবান করিতে চাই।" অনতিকাল পরে দেখা গেল, এই সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশ আর হিন্দুধর্ম এক হয়ে গিয়েছে।

বিদ্যালয়ের জীবন চর্চায় প্রাচীন ভারত দেখতে দেখতে হিন্দুভারত হয়ে উঠল। হিন্দুধর্মের বর্ণাঢ্য ছটামণ্ডলের সম্মোহনে ক্রমে রবীন্দ্রনাথ একজন অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়ে উঠলেন এবং আশ্রম বিদ্যালয়ে সহিংসতার অনুশাসন, বর্ণাশ্রম, নির্দিষ্ট ভেদাভেদ, ব্রাহ্মণ্য গরিমা সবই ঢুকে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, "অব্রাহ্মণ শিক্ষক ব্রাহ্মণ ছাত্রের প্রণম্য নয়।"

(সত্যেন্দ্রনাথ রায়: রবীন্দ্র মননে হিন্দু ধর্ম, শারদীয় দেশ, ১৪০৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৩০৩)

ব্রাহ্মণ ছাত্রের স্থান অবাহ্মণ শিক্ষকের উপরে 'রবীন্দ্রনাথের বিধান, বর্ণাশ্রম, নির্দিষ্ট ভেদাভেদ' প্রচলিত থাকায় শান্তিনিকেতনের ধারে কাছে শূদ্র আর ঘেঁষতে পারতো না। উপরে উদ্ধৃত ক্রমে 'রবীন্দ্রনাথ একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়ে উঠলেন' অংশটুকু লক্ষণীয়। নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন বলে হিন্দু মৌলবাদী রবীন্দ্রনাথকে তাই বিদেশী পত্রিকা 'হিন্দু কবি' রূপে চিহ্নিত করতো, বাঙালী কবি বলা হয়নি।

www.pathagar.com

আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো এগজামিনার ৬ই অক্টোবর ১৯১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদের অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো ঃ

"Word of a plot to assassinate Robindra Nath Tagore, Hindu poet and Nobel prize winner reach the police yesterday and led to extraordinary precautions to guard him in the apartment at the Palace Hotel and at the Columbia Theater where he lectured in the afternoon.

(গতকাল পুলিশের নিকট একজন হিন্দু কবি ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবীন্দ্রনাথকে হত্যার চক্রান্তের সংবাদ আসা মাত্র প্যালেস হোটেলে তাঁর এপার্টমেন্টে এবং কলম্বিয়া থিয়েটার যেখানে তিনি ভাষণ দেন সেখানে অতিরিক্তি সতর্কাবস্থা গ্রহণ করা হয়) সংবাদটিতে হিন্দু পয়েট বলা হয়েছে, বেঙ্গলি পোয়েট বলা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে হিন্দু পরে বাঙ্গালী-এ বিষয়টি বিশ্ববাসী ভালোভাবেই জানতো। যেমন আমরা প্রথমে মুসলমান পরে বাঙালী ও বাংলাদেশী। হিন্দুর জাতিভেদ প্রথার উগ্র সমর্থক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

পৌত্তলিক রবীন্দ্রনাথের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারাটা জীবনই ছিলো ইসলামের পরিপন্থী। মুসলমানের ঘরে ছেলে জন্মগ্রহন করলে কানে আযান দেয়া হয়, রবীন্দ্রনাথের কানে আযান দেয়া তো দূরের কথা, শাঁখ বাজানো হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের মতো দেনমোহর দিয়ে বিয়ে করেননি উল্টো মোটা অংকের পণের টাকা নিয়ে বিয়ে করেছিলেন। অবশেষে মৃত্যুর পরেও অগ্নিগর্ভে বিলীন হয়ে গেলেন। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে তৌহিদবাদীর সাথে পৌত্তলিক রবীন্দ্রনাথের কোন মিল নেই। এই পৌত্তলিক রবীন্দ্রনাথ বরং তৌহিদবাদীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'উত্তরাধিকার' পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ রবীন্দ্রনাথের মুসলিম বিদ্বেষ সম্পর্কে লিখেছেনঃ

"কিন্তু শিলাইদহ জমিদারী এলাকায় যেখানে প্রায় সকল রায়তই ছিল মুসলমান, সেখানে গরু কোরবানী নিষিদ্ধ করা কিংবা একতরফাভাবে খাজনা বাড়িয়ে মুসলিম প্রজাদের প্রতিরোধের মুখে তা আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের শায়েস্তা করার জন্য তাদের গ্রামে হিন্দু (নমশূদ্র) প্রজাপত্তন, নিশ্চয়ই কোন উদার, অসাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ বহন করে না।"

(ড. আহমদ শরীফ ঃ রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন ঃ বাংলা একাডেমী ত্রৈমাসিক উত্তরাধিকার, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৩)

রবীন্দ্রনাথ প্রচারে ব্রাহ্ম কিন্তু প্রকারে ব্রাহ্মণ। তিনি দেবী কাত্যায়নীর পূজা খুব ধূমধামের সাথেই করতেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিল্পপতি অধ্যাপক ড. মাযহারুল ইসলাম লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

"শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ পৌষমেলার প্রবর্তন করেন ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বরে। তারই অনুকরণে শিলাইদহে স্থানীয় দেবী কাত্যায়নীর পূজা উপলক্ষে ১৯০২ সালে ১৫ দিন ব্যাপী স্বদেশী মেলার প্রবর্তন করেন, যেখানে লাঠিখেলা ও যাত্রাভিনয় প্রাধান্য পায়। ওই মেলাতেই রাখীবন্ধন ব্যবস্থাও চালু হয়।"

(মযহারুল ইসলাম ঃ কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ ঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭)

শান্তিনিকেতনের অনুসরণে শিলাইদহে স্বদেশী মেলার প্রবর্তন করা হলেও কিন্তু শান্তিনিকেতনের অনুসরণে শিলাইদহে কোন বিশ্ববিদ্যালয় দূরের কথা সামান্য একটা পাঠশালা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেননি সুচতুর রবীন্দ্রনাথ। মুসলমান প্রধান শিলাইদহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলে মুসলমানগণ শিক্ষিত হয়ে উঠবে এই ভয়ে চতুর জমিদার রবীন্দ্রনাথ এ কাজটি করেননি। শিলাইদহের জমিদারীর আয় তিনি শান্তিনিকেতনে ব্যয় করতেন।

পশ্চিম বাংলার 'স্বাধীন বাংলা' নামক পত্রিকা ড. আহমদ শরীফের একটা ইন্টারভিউ প্রকাশ করে। ঢাকার দৈনিক "বাংলাবাজার" পত্রিকা তার ঐ সম্পূর্ণ ইন্টারভিউ দুই কিস্তিতে ছাপিয়েছে। প্রথমটি ছাপা হয়েছে ২৪শে এপ্রিল ১৯৯৭ আর পরেরটা ১লা মে ১৯৯৭। ১লা মে প্রকাশিত কিস্তির অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো ঃ

"আমাদের প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথের যথাযথ মূল্যায়ন প্রয়োজন। তার সুদীর্ঘ আশি বছরের জীবনে কোনও ত্রুটি নেই, এটা কোনও কথা হলো? অন্নদাশংকর রায় বলেছেন, শান্তিনিকেতনে একটা চাকরি পেয়ে সরকারী চাকরী ছেড়ে দেবার ইচেছ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হলেন জমিদার, মর্জির ঠিক নেই, কখন আবার চাকরি নট করে দিলে তার খাবার অভাব হবে। রবীন্দ্রনাথ ইন্টলারেন্ট ছিলেন। যে মাষ্টার রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিবাদ করতেন তার চাকরি থাকত না। রবীন্দ্রনাথ মদ খেতেন কেউ কেউ বলেছেন। তিনি যেখানে গেছেন, মেয়েদের প্রেমে পড়েছেন, টিস করেছেন। জগদীশ ভট্টাচার্য ইনিয়ে বিনিয়ে বহু নারী সম্পর্কে বলবার চেষ্টা করেছেন, এমন যেন গুরুদেবের নিন্দে না হয়। রবীন্দ্রনাথের আরো একটি লোভ ছিল পৌরহিত্যের লোভ।"

বাংলাদেশের প্রাক্তন এক প্রেসিডেন্ট এহেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবিতা রচনা করে সর্বসমক্ষে সগৌরবে তা আবৃত্তি করে শোনান। দৈনিক জনতা ১০ ই মে ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাটি তুলে ধরা হলোঃ

রবীন্দ্রনাথ
-হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ
হে কবি
সূর্যের সহজ আলোর মতো

www.pathagar.com

তোমার কবিতার বিস্তার।
তোমার কবিতা ছড়িয়ে আছে
আমাদের সকল অনুভবে।
তুমি নির্মাণ করেছো আমাদের চিন্তার
সকল ভাষা
আমাদের সকল গানের শব্দ।
তুমি আছো
আমাদের সকল আবেগে উচ্ছাসে বর্ণনায়-
আমাদের ধ্যানের সকল
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ ভরে আছে
তোমার অনুভবের সকল সৌন্দর্যে -
আমাদের সকল প্রভাত সন্ধ্যা রাত্রি,
আলো অন্ধকার
চিরকালের জন্য ভরে আছে
তোমার ঘনিষ্ঠ নিঃশ্বাসে-
তুমি আছো
আমাদের হৃদয়ের প্রান্তদেশে
স্নিগ্ধ কুঞ্জের ক্ষুদ্র গৃহকোণে
আমাদের সকল অস্তিত্ব জুড়ে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল শিলাইদহে "রবীন্দ্র জয়ন্তী" অনুষ্ঠানে এ কবিতা পাঠ করেন।"

(দৈনিক জনতা, ঢাকা, ১০ই মে ১৯৯০)

মুসলমানের দেশের প্রেসিডেন্ট "অমুসলমান রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকল অস্তিত্ব জুড়ে আছেন" ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকল অস্তিত্ব জুড়ে আছেন- প্রেসিডেন্ট এরশাদ তার কবিতায় লিখেছেন। শিবভক্ত তথা পৌত্তলিক রবীন্দ্রনাথ কি করে তৌহিদবাদী জনসাধারণের সকল অস্তিত্ব জুড়ে থাকেন, বোধগম্য হলো না। তিনি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে কোনো কবিতা লেখেননি। রবীন্দ্রপূজারী এই কবি এরশাদ আবার স্বপ্নাদেশ পেতেন কবে কোন মসজিদে গিয়ে ভাষণ দিতে হবে।

"কোম্পানীকা মাল, দরিয়ামে ঢাল।" রাষ্ট্রের টাকা রাষ্ট্রপতি খরচ করবেন, বলার কি আছে। তিন কোটি টাকা ব্যয়ে শিলাইদহে তিন দিনব্যাপী রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হলো।প্রেসিডেণ্ড এরশাদ স্বয়ং শিলাইদহে গিয়ে উদ্বোধন করলেন। প্রেসিডেন্টকে আভ্যর্থনা জানানোর জন্য কুষ্টিয়া শহর থেকে ৫০০ (পাঁচশত)

www.pathagar.com

স্কুলছাত্রী শিলাইদহে এলো। রবীন্দ্রনাথের একটি ক্রেস্ট অবশ্য স্বর্ণের, প্রেসিডেন্টকে দেয়া হল। ভারত থেকে এলেন রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক মি. অমিতাভ চৌধুরী, বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ মি. সুবিনয় রায়, আনন্দবাজার গ্রুপের পাক্ষিক পত্রিকা 'সানন্দা' প্রধান প্রতিবেদক মি. শংকরলাল ভট্টাচার্য প্রমুখ এলেন। তারা বললেনঃ "১৮৯০ সলে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী তদারকির দায়িত্ব পাওয়ার শতবর্ষ পরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ সরকার একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করেছে।" অর্থাৎ কবির প্রতি নয়, জমিদারের প্রতি তার প্রজাকুলের আনুগত্য প্রদর্শন। অতঃপর রবীন্দ্রজয়ন্তী জাতীয় পর্যায়ে পালিত হতে লাগলো।

গত ২৫শে বৈশাখ (৮ই মে ১৯৯৭) রবীন্দ্রনাথের ১৩৬-তম জন্মজয়ন্তী মহাসমারোহে পালিত হলো। রবীন্দ্রনাথের জন্ম যেখানে অর্থাৎ যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তিনি, সেই পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে তার জন্মজয়ন্তী পালিত হয় না। তবে বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে পালিত হয়, কারণ তার জমিদারী ছিলো এদেশে, আমরা তার প্রজা ছিলাম। জমিদারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশই নাকি জাতীয় পর্যায়ে জয়ন্তী পালনের উদ্দেশ্য, ভারতীয় সাংবাদিকদের তো মন্তব্য তাই। গত ১১ই মে ১৯৯৭ রোববার রাত ৮ টায় বাংলা সংবাদের পর সংবাদ বার্তায় দেখানো হলো শিলাইদহ ও শাহজাদপুরে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত দৃশ্যাবলী। উপস্থাপিকা 'জাতীয় পর্যায়' বললেন। কুষ্টিয়ার শিলাইদহে জাতীয় পর্যায়ে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে তৎকালীন বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বলেন,

'আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেতনার ফসল। তাই রবীন্দ্রনাথ বিরাজ করছে রবির মতো। সেই আলোয় আমরা পথ দেখি।"

তৎকালীন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন,

"কবিগুরু ও শেখ মুজিব একটি বৃন্তে দুটি ফুল। আমরা রবিঠাকুরের চেতনায় আন্দোলন করে ক্ষমতায় এসেছি।"

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কতোটা বাড়াবাড়ি করা হয়, তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদের নিম্নোক্ত মন্তব্যে অনুমান করা যায়ঃ

"রবীন্দ্রনাথ এখন বেশ বড় রকমের এক দেবতা হয়ে উঠেছেন বাঙালীর, আমি তাঁর প্রতিভার অনুরাগী, কিন্তু আমি মনে করি না যে তিনি বিচারের ওপরে।"

(হুমায়ূন আজাদঃ আমার অবিশ্বাসঃ আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭ পৃ. - ১৩২)

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ আজ একদল মুসলমান বুদ্ধিজীবীর নিকট দেবতা। বাংলা একাডেমী চেয়ারম্যান কবি শামসুর রহমান রবীন্দ্রনাথকে দেবতার আসনে বসিয়ে দেবতা সম্বোধন করে কবিতা লিখেছেন। কবিতাটির অংশ বিশেষ ঃ

দাঁড়িয়ে আছেন এক দেবমূর্তি
- শামসুর রহমান
'কার উপস্থিতির আভায় ঘর
উদ্ভাসিত হলো এবং আমি চোখ কচলে দেখি
আমার টেবিলে হাত রেখে একটু ঝুঁকে
দাড়িয়ে আছেন এক দেবমূর্তি । আলখাল্লা পরা
অসামান্য ব্যক্তিটি যে রবীন্দ্রনাথ, চিনতে
দেরি হলো না ।.....'
(দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ৬ আগষ্ট ১৯৯৬)

মুষ্ঠিমেয় বুদ্ধিজীবি রবীন্দ্রনাথকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করা শুর করেছে। সমগ্র দেশবাসী যাতে দেবতা মানে সেজন্য সরকারের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র অর্থাৎ বিটিভিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। বিটিভি নাটকে এখন রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যতীত অন্য কোন সঙ্গীত শোনা যায় না। দর্শক সমক্ষে এখন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ।

শ্রী গিরিজা শংকর রায় চৌধুরী বলেছেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' সম্বন্ধে কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়াছে। দুঃখের বিষয় তাঁহার এই বিখ্যাত কবিতাটি কাব্য গ্রন্থে নাই।"

দস্যুকে দেবতা করা হয়েছিল। ইতিহাসের ধোপে টেকেনি। তাই এই বিখ্যাত কবিতাটি কাব্যগ্রন্থে নাই। বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী ইশা খাঁকে নিয়ে কবিতা লেখেননি। লিখেছেন মারাঠা শিবাজীকে নিয়ে। যে শিবাজী বীরের কলঙ্ক। মোঘল সেনাপতি আফজল খাঁর সাথে সম্মুখ সমরে পারবেন না জেনে তাকে ছলনায় ভুলিয়ে আলোচনার নাম করে এনে নিরস্ত্র নিঃসঙ্গ অবস্থায় হত্যা করেছিলেন। এই কাপুরুষ হলো হিন্দু জাতির নিকট বীর। আর ঈশা খাঁ মানসিংহের ভগ্ন তরবারীর সুযোগ না নিয়ে নিজের তরবারী মানসিংহকে দিয়েছিলেন আত্মরক্ষার জন্য। ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে ঈশা খাঁর বীরত্বগাঁথা।

মুসলমান ঈশা খাঁ বাঙ্গালী হওয়া সত্বেও পরিত্যাক্ত হলেন। আর অবাঙ্গালী শিবাজী হিন্দু বলে হিন্দু রবীন্দ্রনাথের নিকট বরণীয় হলেন। বাঙ্গালীত্বের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিলো হিন্দুত্ব।

গত ৮ই মে ১৯৯৭ (২৫ শে বৈশাখ) কুষ্টিয়ার শিলাইদহে কুঠিবাড়িতে আয়োজিত রবীন্দ্রনাথের ১৩৬-তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে কবীর চৌধুরী দাবী করেছেন, "বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ।" একই দিন ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীতে ড. মযহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত "স্বদেশ সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক আলোচনায় কায়সুল হক বলেছেন ঃ "রবীন্দ্রনাথই বাঙালী সংস্কৃতির বিধাতা।" মালেকা বেগম বলেছেন, "উত্তরাধিকার রক্ষায় মুসলমানী সংস্কৃতি বদলাতে হবে।"

বিধাতা অর্থ ভগবান-ঈশ্বর। রবীন্দ্রনাথ বর্তমানে বাঙালীর ভগবান। তাই মালেকা বেগম দাবী করেছে, "উত্তরাধিকার রক্ষায় মুসলমানী সংস্কৃতি বদলাতে হবে।" কতোখানি খুঁটির জোর থাকলে ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে দাঁড়িয়ে মুসলমান মহিলা একথা উচচারন করতে পারে? রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার হতে হলে আমাদের নামায-রোযা ছাড়তে হবে, আল কোরআন ছেড়ে বেদ-বেদান্ত ধরতে হবে, মরলে পরে কবর না দিয়ে তার মতো শ্মশানঘাটে নিয়ে গিয়ে আমাদের শব দাহ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। খণ্ডিত ভারতের খণ্ডিত পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশ তার কল্পনার ছিলো না। বঙ্গভঙ্গ হয়েছিলো ঠিকই, রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' বঙ্গভঙ্গ রদ করে আবার অখণ্ড বাংলায় পরিনত করে। শেখ মুজিবুর রহমান এ কারণেই "আমার সোনার বাংলা"কে জাতীয় সঙ্গীত করতে চাননি। তাঁর ইচছা ছিলো ডি.এল. রায়ের 'ধন্যধান্যে পুষ্পভরা' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হোক। তিনি যখন পাকিস্তানের জেলে তখন ভারতের নির্দেশে 'আমার সোনার বাংলা' জাতীয় সঙ্গীত করা হলো। কলকাতা থেকে প্রকাশিত শ্রীমতি মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত "নবজাতক" পত্রিকায় বলা হয়েছেঃ

"বাংলাদেশের জাতীয়তা আজ ঐতিহাসিক কারণেই রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলাকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং ইতিহাসের এটাও একটা আশ্চর্য ঘটনা যে, ঐকই কবির রচিত দুটি সঙ্গীত দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত। এর পরেও ভারত ও বাংলাদেশের মৈত্রীর উপর আঘাত হানবে কে? রবীন্দ্রনাথ এই দুই দেশকে যে রাখী বন্ধনে বেঁধে দিয়েছেন, সেই বাঁধ নিশ্চয়ই অটুট থাকবে।"

[বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ঃ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ঃ নবজাতক (কলকাতা) ঃ স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যা ঃ অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৭৮, পৃঃ ১৭৬]

এই বন্ধন অখণ্ড ভারতের সূচনা করবে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে বিধাতার আসনে বসানোর চেষ্টা করা হচেছ এবং মুসলমানী সংস্কৃতি বদলানোর আহবান জানানো হয়েছে।

'রবীন্দ্রস্তুতি কারণে অকারণে' শীর্ষক নিবন্ধে মাসুদ খন্দকার বলেন,

"রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ঠাকুর বাড়ী তথা ব্রাহ্মপরিবারে। তার প্রেরণার উৎস ছিলো হিন্দু পুরাণ ও বেদ-বেদান্তের দর্শন। শিখ দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিও তার শ্রদ্ধাবোধ ছিলো। কিন্তু ইসলামী আদর্শের প্রতি তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ তো

www.pathagar.com

ছিলোই না বরং তিনি ছিলেন মুসলিম বিদ্বেষী। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ যে সাম্প্রদায়িক ছিলেন, এটা এখন প্রমাণিত সত্য। বাংলাদেশের বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ড. আহমদ শরীফ পশ্চিমবঙ্গের 'স্বাধীন বাংলা' পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রদানকালে বলেন, "মুসলমান প্রজাদের চিট করার জন্য নমঃশুদ্র প্রজা এনে বসতি স্থাপনের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকেই বের হয়েছিল।"

'ব্রাহ্মণ', 'ভগ্নমন্দির', 'দেবতার গ্রাম', 'মদন ভস্মের পূর্বে', 'মদনভস্মের পর', 'নরকবাস', 'সুরদাসের প্রার্থনা', 'অহল্যার প্রতি', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী', 'সংবাদ', 'বিদায় অভিশাপ', 'পণরক্ষা', 'মেঘদূত', 'বিসর্জন', 'উর্বশী', 'পুরস্কার' ইত্যাদি কবিতা হিন্দু দর্শনের প্রেরণা থেকেই রচিত। তার বহু সংখ্যক সঙ্গীতও একই ভাবধারা থেকে উৎসারিত। আর 'পূজারিনী', 'অভিসার', 'পরিশোধ' ইত্যাদি কবিতা বৌদ্ধ দর্শন ও উপাখ্যান নির্ভর। অপরদিকে তার মুসলিম বিদ্বেষ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'বন্দীবীর', 'হোরিখেলা' প্রভৃতি কবিতায়। 'দলিয়া', 'জয়পরাজয়' প্রভৃতি ছোটগল্পও মুসলিম বিদ্বেষ তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। 'যবন' (অর্থাৎ ম্লেচ্ছ-অস্পৃশ্য) শব্দটি মুসলমানদের প্রতি ঘৃণাসূচক ব্যবহার করতো হিন্দুরা। রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর লেখায় এ শব্দটির যথেচ্ছ প্রয়োগ করেছেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন হিন্দু পুরাণ ও বেদ-বেদান্তের প্রতি চরম নিষ্ঠাবান, যার প্রেরণায় উৎস ছিলেন মারাঠী নৃপতি ছত্রপতি শিবাজী, যার কবিতা, গান বা অন্য কোনো লেখায় মুসলমানদের মহত্ত্ব তো দূরের কথা, সাধারণ সৌজন্যবোধটুকু প্রকাশ পায়নি, যিনি ছিলেন চরম সাম্প্রদায়িক, সেই রবীন্দ্রনাথ কি করে ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন? তাহলে কি মুসলমানদের প্রতি চরম ঘৃণা, বিদ্বেষ আর সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানোই ধর্মনিরপেক্ষতা? আওয়ামী নেতৃবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের মতো এহেন হিন্দু সাম্প্রদায়িক মুসলিম বিদ্বেষীর চেতনাকে কিভাবে নিজেদের চেতনা বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন? দাদাবাবুদের প্রিয়ভাজন থাকার জন্য?

তৎকালীন পরিবেশমন্ত্রী সাজেদা চৌধূরী বলেছেন, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা রবীদ্রনাথের চেতনার ফসল।" ইতিহাস বিকৃতি আর কাকে বলে? বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা রবীদ্রনাথ কখন, কোথায়, কিভাবে বলেছেন? পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির কথা তার কোন বইতে আছে? স্বাধীন বাংলাদেশেই বা তার কোন চিন্তা-চেতনা থেকে উদ্ভুত?

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সালের ৭ই মে (২৫ শে বৈশাখ ১২৬৮) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে। তাঁর মৃত্যু ১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮)। অর্থাৎ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পাসের এক বছর পর তার মহা প্রয়াণ

www.pathagar.com

ঘটে। তাহলে কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার এতো আগে তিনি কিভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, ভারত ভাগ হবে? এরপর ভারত ভাগ হয়ে মুসলমানদের পৃথক আবাস পাকিস্তান রাস্ট্রের জন্ম ১৯৪৭ সালে। আর পাকিস্তান ভেঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলটির বাংলাদেশ নামধারণ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। অথচ রবীন্দ্রনাথ ইহধাম ত্যাগ করেছেন ১৯৪১ সালে। তাহলে যে রবীন্দ্রনাথের সামনে ভারত ভাগেরই কোনো আলামত ছিলো না, সেই রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নকশা কে এঁকে দিয়েছিল? পূর্ব পাকিস্তানের ধারণাই বা তিনি পেলেন কোত্থেকে? পূর্ব পাকিস্তান যে পরবর্তীতে বাংলাদেশ নাম ধারণ করবে, তাই বা তিনি জেনেছিলেন কিভাবে? কারণ, রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাঝে রয়ে গেছে তিরিশটি বছরের বিস্তর ফারাক। এতোদিনে তো রবীন্দ্রনাথের হাড়-গোড় ছাই ভস্ম মাটির সাথে মিশে গিয়ে অণু-পরমাণুতে পরিণত হবার কথা। বরং যে পূর্ববঙ্গ গঠন ছিলো অত্র অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য পরম কল্যাণকর, ১৯০৫ সালে বঙ্গ প্রদেশকে ভাগ করে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে 'পূর্ববঙ্গ' গঠিত হলে উপমহাদেশের সকল হিন্দু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুরু হয় বঙ্গভঙ্গকে রদ করার জন্য আন্দোলন। এ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এদের আন্দোলনের কারণেই সেদিন এ অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাস পূর্ববঙ্গ গঠিত হতে পারেনি। রবীন্দ্রাথ বরাবরই অখন্ড ভারতের পক্ষে ছিলেন।

তবুও যদি আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ইতিহাস বিকৃত করে বলে থাকেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপরাটি রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নে দেখেছেন, তাহলে শেখ মুজিবের সাথে রবীন্দ্রনাথের অন্তত এই একটি বিষয়ে মিল আছে। সাবেক সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, "কবিগুরু ও শেখ মুজিব একই বৃন্তে দুটি ফুল।" মন্ত্রী মহোদয় সম্ভবত দুজনার স্বপ্নের দিকটার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। কেননা শেখ মুজিবও নাকি বাস্তব কর্মের পরিবর্তে শুধু স্বপ্নই দেখতেন। সোনার বাংলার স্বপ, দ্বিতীয় বিপ্লবের স্বপ্ন, আইসিসি-তে বাংলাদেশের ক্রিকেট দল চাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন, খুন-রাহাজানি, ধর্ষণের স্বপ্ন, আরও কতো কি!

এতো গেলো রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-দর্শন-চিন্তা-চেতনার কথা। ব্যক্তিগত জীবনেও রবীন্দ্রনাথ খুব একটা সুবিধার লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঔপনিবেশিক আমলে উমিচাঁদ, জগতশেঠ, রায়দূর্লভ, রাজবল্লভসহ আর দশটা হিন্দুর মতোই ইংরেজদের দালাল। ইংরেজদের দালালী করে তিনি টুপাইসও কামিয়েছেন বলে প্রমাণ আছে। তিনি ইংরেজদের এতোই গুণমুগ্ধ ছিলেন যে, বৃটিশ কর্তৃক নিয়োজিত বড়লাট পঞ্চম জর্জ-এর ভারতে আগমন উপলক্ষে "জনগণমন" সঙ্গীতটি রচনা করে ইংরেজদের বিশেষ প্রিয়ভাজন হিসেবে আস্থা অর্জন করেছিলেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন সক্রিয় সংগঠক, মৌলবাদ বিরোধী, প্রগতিশীল ও বাম পন্থীদের ভন্ড বলে পরিচিত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি ড. আহমদ শরীফ কলকাতার 'স্বাধীন বাংলা' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত ও জমিদারী জীবন সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন, যা 'বাংলাবাজার' পত্রিকায় ২৪শে এপ্রিল ও ১লা মে'৯৭ দু'কিস্তিতে হুবহু ছাপা হয়েছে। এ সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজদের প্রতি মোসাহেবী সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ বলেছেনঃ "জনগণমন" তিনি লিখেছেন আশুতোষ চৌধুরীর পরামর্শে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ-এর অভিষেক উপলক্ষে। ...এ রবীন্দ্রনাথই ড. ডেভিড-এর মধ্যস্থতায় এণ্ডারসন-এর কাছ থেকে টাকা নিয়ে 'চার অধ্যায়' লেখেন। এটা এখন প্রমাণ হয়ে গেছে। শুধু তাই-ই নয়, 'ঘরে-বাইরে'ও তাকে টাকা দিয়ে লেখানো হয়। অনেক অন্ধ রবীন্দ্রভক্ত বলেছেন যে, পঞ্চম জর্জকে বন্দনা করে নয় 'জনগণমন' আসলে ঈশ্বরকে বন্দনা করে লেখা। ঈশ্বর তো বিশ্বব্যাপী। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর কেন শুধু বৃটিশ ভারতের ঔপনিবেশের ভৌগলিক সীমায় আবদ্ধ রইলেন?"

ড. আহমদ শরীফ পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে বলেন ঃ "জমিদার হিসেবে ঠাকুর পরিবার ছিল অত্যাচারী। গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। বুট পরে প্রজাকে লাথি মেরেছেন পায়ে দলেছেন দেবন ঠাকুর (রবীন্দনাথের পিতা)। এটাই রেকর্ড করেছিল হরিনাথ মজুমদার। যিনি মহর্ষি বলে পরিচিত, তিনি এ রকমভাবে মানুষকে পদাঘাতে দলিত করেন।... ঠাকুর পরিবার কখনো প্রজার কোন উপকার করে নাই। স্কুল করা, দীঘি কাটানো, এসব কখনো করে নাই।...কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় ঠাকুর পরিবারের প্রজাপীড়নের কথা লিখে ঠাকুর পরিবারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

এসব জুলুম অত্যাচারের কারণেই পশ্চিবঙ্গের জনসাধারণের কাছে রবীন্দ্রনাথ তেমন কোন মহৎ ব্যক্তি নন। এসব কারণেই আজও পশ্চিমবঙ্গে তার জন্মজয়ন্তী জাতীয় পর্যায়ে পালিত হয় না। অথচ আমরা রবীন্দ্রনাথের এমনই আজ্ঞাবহ প্রজা, এদেশে সামান্য জমিদারী থাকার কারণে আমরা তার জন্মজয়ন্তী পালন করছি জাতীয় পর্যায়ে। এর ফলে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে গোলামের জাতি হিসেবে প্রমাণ করছি। আমাদের এ 'গোলাম হোসেন' হওয়ার প্রবণতা যে কবে দূর হবে আল্লাহই জানেন। আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক অতি উৎসাহী 'গোলাম হোসেন' হয়তো গোলামীর দিকটা আড়াল করার স্বার্থেই বলবেন, তারা রবীন্দ্র ভক্ত তার কাব্য-প্রীতির কারণে। কিন্তু শুধুমাত্র কাব্য-প্রীতির কারণেই কি একজন বিতর্কিত ব্যক্তির ভক্ত হওয়া কোনো সৎ মানুষের জন্য শোভা পায়? তবুও কাব্য সাহিত্যের মান অত্যন্ত উঁচু, সুপাঠ্য ও সুললিত হলে না হয় একটা কথা ছিলো। কাব্য প্রীতির যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যেতো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে তো তেমন কিছুই নেই। তার

www.pathagar.com

কাব্য-সাহিত্যের মান উর্দু ও ফার্সি ভাষার দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্তরের কবিদের কাব্য-সৌন্দর্যের চেয়েও নীচু। উদ্ধৃত মন্তব্যটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের মান নির্ণয়ে যথেষ্ট সহায়কঃ "সাধারণ বাঙালী পাঠক হিসেবে গীতাঞ্জলীর সহিত যতটুকু পরিচিত হতে সমর্থ হয়েছি, তদানুসারে আমরা দৃঢ়তার সহিত বলতে পারি যে, ফার্সি ও উর্দুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের অনেক কবি গীতাঞ্জলীর কাব্য-সন্দর্ভে এটা অপেক্ষা অনেক উচচ স্তরের জ্ঞান, ভাব ও কল্পনার সমাবেশ সাধনে এক মধুরতর রস সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন। উভয়ের মধ্যে তুলনায় সমালোচনা করিয়া ইহা খুব সহজে প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।" *(আলোচনা ঃ নোবেল প্রাইজ, সম্পাদক, মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা /সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত/ মুস্তফা নূরুল ইসলাম।)*

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন নকলবাজ কবি । তিনি যে নকলবাজ কবি ছিলেন এটা এখন আর রাখ-ঢাক করে বলার বিষয় নয়। ড. আহমদ শরীফের মতে ঃ "নারায়ণ বিশ্বাস প্রথম ধরে দেন 'গোরা' এবং 'ঘরে বাইরে'র নকল। একথা অবশ্য আগে বলবার চেষ্টা করেছিলেন প্রিয় রঞ্জন সেন। তারপর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত একটি মেয়েও 'গোরা' এবং 'ঘরে বাইরে'র সাথে দুটি ইংরেজী উপন্যাসের সাদৃশ্যের কথা বলেছিলেন। এর বেশি বলতে সাহস পাননি। কালমোহন ধরে দিয়েছিলেন রবীন্দ্র কবিতার নকল। বঙ্কিমচন্দ্রের কোন ধারণা ছিলো না। কারণ তার ফরমেটিভ পিরিয়ডে ইংরেজ ভারতবর্ষ জয় করে নাই। সেটা এসেছে রবীন্দ্রনাথে, যে রবীন্দ্রনাথ মিছে কথা কয়।" *(পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকার ঃ স্বাধীন বাংলা পত্রিকা, কলকাতা)*

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের মান যে তেমন উঁচু নয়, তার প্রমাণ আরো পাওয়া যায় বাংলাদেশ হওয়ার পর নয়াদিল্লী থেকে রেবতীভূষণ ঘোষ কর্তৃক কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্যা শ্রীমতি মৈত্রেয়ী দেবীর নিকট লেখা পত্র থেকে," আপনার গুরুদেব যে এতোবড় ঋষি, উত্তরকালের কে তা জানতো? সমস্ত ঘটনাটা যেন এক মন্ত্রঘটিত ব্যাপার; ঐন্দ্রজালিকের কাণ্ড বলে মনে হয়। আমাদের মার্তৃভাষায় কি জাদু তিনি সঞ্চারিত করে গেছেন, যার শক্তিতে একটা গোটা জাতি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো জীবন বাজী রেখে? অমন যে ইসলামী তমুদ্দুনের ভ্রুকটি তাও তুচছ হয়ে গেল। আমরা কলকাত্তিয়া সাহিত্যিকরা তাকে হয় ভুলতে চেষ্টা করেছি বা হয় শিকেয় তুলতে তৎপর হয়েছিলাম। নেহাৎ সঙ্গীত (তাও স্বরলিপি সর্বস্ব তোতা বুলির মতো) ধারা দিয়েই রবীন্দ্র চিন্তা প্রবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু ওরা কাব্য-সঙ্গীত-দর্শন সব মিলিয়ে গোটা রবীন্দ্রনাথকেই মনে হয় আত্মসাৎ করে নিল।*(ডাকঘর ঃ নবজাতক, ৮ম বর্ষ, স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যা)*

www.pathagar.com

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে দুটো জিনিস স্পষ্ট। প্রথমত রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একটি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার মতো তেমন কিছুই ছিলো না। দ্বিতীয়ত তার কাব্য-সাহিত্যে তেমন কিছু না থাকার কারণেই কলকাত্তিয়া সাহিত্যিকরা তাকে হয় ভুলতে, নয়তো শিকেয় তুলতে চেষ্টা করেছিলো। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে পাত্তাই পায়নি। পূর্ববঙ্গের জমিদারী আয়ের সবটুকু রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গেই ব্যয় করেছেন, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দিয়েছেন, এখানে একটা পাঠশালা পর্যন্ত দেননি। তবু পশ্চিমবঙ্গবাসীর নিকট তার কদর নেই। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমবঙ্গে যেমন কদর নেই, তেমনি ঊনিশ শতকে তার বইয়ের কাটতিও ছিলো না। ঊনিশ শতকে মুসলমান অবশ্য বাঙালী বলে গণ্য হয়নি। বাঙ্গালী মানে হিন্দু। কলকাতা থেকে প্রকাশিত শারদিয়া আনন্দ বাজার পত্রিকায় এই নিদারুন সত্যটি তুলে ধরেছেন অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। বিভিন্ন গ্রন্থের প্রচ্ছদের ছবিসহ প্রকাশিত সুদীর্ঘ প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলোঃ

"রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমার্ধ কাটে ঊনিশ শতকে, শেষ অর্ধাংশ কাটে বর্তমান শতকে (বিংশ শতকে) তার আশি বছরের জীবনে প্রকাশিত দুইশত বইয়ের মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ বই ছাপা হয়েছিল বিগত শতকে (ঊনিশ শতকে), কবি জীবনের প্রথম চারদশকে। ঊনবিংশ শতকে রবীন্দ্রনাথের বইপত্রের বাজার কেমন ছিল অর্থাৎ সেকালে তার বইয়ের দরদাম কত ছিল, ক্রয় বিক্রয় কি রকম হতো বইয়ের এডিশন হতো কিনা, মুদ্রন সংখ্যা কোন বইয়ের কি রকম ছিল, বইগুলো কোনটি কত ফর্মার ছিল, বইয়ের কাগজ এবং ছাপা বাঁধাই কেমন ছিল, তার বইপত্রের বিজ্ঞাপন কেমন ছিল, গ্রন্থকর্তারূপে অর্থপ্রাপ্তি কিছু ঘটত কিনা ইত্যাদি নানা কৌতুহল ও জিজ্ঞাসার কিছু উত্তর সংগ্রহের চেষ্টা করা গেছে এই নিবন্ধে।...

আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পঁচিশটি বই অবলম্বনে সেকালে তার বইয়ের বাজার কেমন ছিল দেখতে চেষ্টা করব। এই পঁচিশটি বই হল ঃ কবি কাহিনী, বনফুল, বাল্মীকি প্রতিভা, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, কাল মৃগয়া, সন্ধ্যা সঙ্গীত, বউ-ঠাকুরাণীর হাট, প্রভাত সঙ্গীত, বিবিধ প্রসঙ্গ, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, নলিনী, শৈশব সঙ্গীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, রামমোহন রায়, আলোচনা, রবিচছায়া, কড়ি ও কোমল, রাজর্ষি, চিঠি-পত্র, সমালোচনা, মায়ার খেলা এবং রাজা ও রাণী।

এই বইগুলির ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাবপত্র নিলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বাজার মোটেই ভাল ছিল না সেকালে। এদিক থেকে বলতে পারি, ঊনিশ শতকের বইয়ের বাজারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন নিষ্প্রভ তারকা। মেঘে ঢাকা তারা, সেদিনের সাধারণ পাঠক সমাজে তার বিশেষ জনপ্রিয়তার কোন নিদর্শন নেই।...

www.pathagar.com

এই বিজ্ঞাপন থেকে এ কথা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সেকালে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বাজার খুবই মন্দা ছিল। বিক্রিবাট্টা যে শুধু কম ছিল তাই নয়, শেষে হাফ প্রাইসে তার বই বিক্রি করতে হল কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, এ বড় কম দুঃসংবাদ নয়।...

যাই হোক মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমাদের কথা হচ্ছিল কাব্যগ্রন্থাবলীর সূলভ মূল্যের বিষয়ে। ছয় অথবা দশ টাকার সেই বৃহৎ গ্রন্থাবলীর কথা। এত সস্তাতেও এ বইয়ের ভাল খদ্দের পেলেন না রবীন্দ্রনাথ সেদিন। গ্রন্থাবলী প্রকাশের চার বছর পরেও এ বইয়ের অনেক কপি অবিক্রিত থেকে যায়।

১৯০০ সালের আগষ্টে প্রিয়নাথ সেনকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'একটা কাজের ভার দেব? আমার বাড়ী তৈরী বাবদ লোকদের কাছে আমি ৫,০০০ টাকা ঋণী, ঐ সম্বন্ধে খুচরা ঋণ আরো কিছু আছে। আমার গ্রন্থাবলী এবং ক্ষণিকা পর্যন্ত কাব্যের copy right কোন ব্যক্তিকে ৬০০০ টাকায় কেনাতে পার? শেষের যে বইগুলো বাজারে আছে সে আমি সিকি মূল্যে তারই কাছে বিক্রী করব। গ্রন্থাবলী যা আছে এক-তৃতীয়াংশ দামে পারবো (কারণ এটাতে সবার অধিকার আছে, আমি স্বাধীন নই) আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস, যে লোক কিনবে সে ঠকবে না।" এ চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বই শুধু অর্ধমূল্যেই নয়, সিকিমূল্যেও তিনি বিক্রি করতে প্রস্তুত ছিলেন ১৯০০ সালের আগষ্ট মাসে।

এই সকল বিবিধ তথ্য ও পরিসংখ্যান থেকে এ কথাই স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, গত শতকে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বাজার আদৌ ভাল ছিল না, তার বইয়ের পাঠক ছিল না যথেষ্ট। খদ্দেরের অভাবে বেচাকেনা ছিল খুবই কম, আর তার ফলে বই থেকে তার অর্থ প্রাপ্তি ঘটেনি বিশেষ কিছুই বলতে গেলে। বই বিক্রির পরিসংখ্যান থেকে বলতে পারি, ঊনিশ শতকের সাধারণ পাঠক সমাজ প্রায় অর্ধশত গ্রন্থের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথকে তাদের একজন জনপ্রিয় লেখক বলে সমাদর করতে পারেননি। এই অনাদর ঊনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী সমাজের পক্ষে এক অগৌরবের সাক্ষী হয়ে রইল।" *(অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য ঃ গত দশকে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বাজার ঃ শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৮৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯)*

যে রবীন্দ্রনাথ তার নিজ জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গে পাত্তা পেলেন না, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মুসলমানদের রুচীর বৈপরীত্য সত্ত্বেও এদেশের একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে তাকে কাব্য-সঙ্গীত-দর্শন সবদিক দিয়েই আত্মসাৎ করার হীনমণ্যতা কেন? কারণটা, তারা খুলে না বললেও অবস্থাদৃষ্টেই প্রতীয়মান হয়, সেটা বাস্তবিক পক্ষেই রাজনেতিক। ষাটের দশকের আগে আমাদের দেশে (পূর্ববঙ্গে) রবীন্দ্রনাথকে মুসলিম জনসাধারণ চিনতোই না। তখন নগণ্যসংখ্যক রাম-বাম বুদ্ধিজীবীর বৈঠক খানায়

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ সীমাবদ্ধ ছিলেন। উপমহাদেশে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি "পাকিস্তান"-এর জন্মের পর রাজনৈতিক কারণেই এদেশে রবীন্দ্রনাথকে জনপ্রিয় করে তোলার অপতৎপরতা শুরু হয়। এ উক্তিটি তারই প্রমাণবহ-"রস গ্রহণে সাধারণের রুচির দৈণ্য যতোই পীড়াদায়ক হোক না কেন, ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথের গান রাজনৈতিক কারনেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো অবিশ্বাস্য রকমে।"

{সংস্কৃতির বিকাশ ধারা ঃ রক্তাক্ত বাংলা ঃ আসাদ চৌধূরী}

রাজনৈতিক কারণেই যে রবীন্দ্রনাথকে এদেশে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে এবং হচ্ছে, পূর্বোল্লিখিত রেবতীভূষণ ঘোষের উক্তি {নবজাতক পত্রিকায় উদ্ধৃত}-এর "অমন যে ইসলামী তমদ্দুনের ভ্রুকুটি তাও তুচ্ছ হয়ে গেল" টিও সেই কথারই স্বীকৃতি দেয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন হিন্দু-মুসলমান ফর্মূলার উদগাতা। বিখ্যাত আওয়ামী নেতা, তুখোড় রাজনীতিবিদ, খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক মরহুম আবুল মনসুর আহমদের মতে "হাজার বছর মুসলমানরা হিন্দুর সাথে একদেশে একত্রে বাস করিয়াছে। হিন্দুদের রাজা হিসেবেও, হিন্দুদের প্রজা হিসেবেও। কিন্তু কোন অবস্থাতেই হিন্দু-মুসলমান সামাজিক ঐক্য হয় নাই। হয় নাই এই জন্য যে, হিন্দুরা চাহিত 'আর্য-অনার্য-শক- হুন' যেখানে 'মহাসাগরের সাগর তীরে' 'লীন' হইয়াছিল, মুসলমানরাও তেমনি মহান হিন্দু সমাজে লীন হইয়া যাউক। তাহাদের শুধু ভারতীয় মুসলমান থাকিলে চলিবে না, 'হিন্দু-মুসলমান' হইতে হইবে। এটা শুধু কংগ্রেসী বা হিন্দু সভার মত ছিল না, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরও মত ছিল।"

{আবুল মনসুর আহমদঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ঃ পৃঃ ১৫৮-১৫৯}

লীন করার লক্ষ্যেই বোধ হয় জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী জাতিকে নতুন সবক দিলেন তাঁর "অপরিহার্য রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধে ঃ

"যতো দিন যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ততো আমার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠছেন। আনন্দ ও বেদনা, সাফল্য ও ব্যর্থতা, প্রতিবাদ ও আত্মসমর্পণ, আশা ও নিরাশা, জীবন ও মৃত্যুর নানা ক্ষণে তিনি আমার পাশে এসে দাঁড়ান। শুধু তার গানের মালা, কবিতার পঙক্তি, গল্প, উপন্যাস, নাটকের চরিত্র ও প্রবন্ধে জ্যোতির্ময় উক্তি দিয়ে নয়। তার জীবন দিয়েও।"

{কবীর চৌধুরী ঃ অপরিহার্য রবীন্দ্রনাথঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, বিশেষ সংখ্যা, ২৫ বৈশাখ ১৪০৬}

এই মুসলিম বিদ্বেষী রবীন্দ্রনাথকে মুসলামানের জীবনে অপরিহার্য করা নিশ্চয়ই কোন সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। মঙ্গল প্রদীপ, রাখীবন্ধন, সিঁদুর সংস্কৃতি

www.pathagar.com

ইত্যাদি যে ভাবে ছেয়ে ফেলেছে তাতে জাতির অস্তিত্ব থাকে কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্র আবর্তে পড়লে মুসলমানের অস্তিত্ব নাশ।

ইসলামী তমদ্দুনের ভ্রুকুটি তুচ্ছ হয়ে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে। 'পূর্ব পাকিস্তান' ভূখন্ডটি "বাংলাদেশ" নাম ধারণ করেছে। বাংলাদেশের একদিকে বঙ্গোপসাগর, আর তিনদিকে ভারত। অর্থাৎ বিশাল ভারতের পেটের ভেতর অস্বস্তিকর অবস্থায় রয়েছে বাংলাদেশ। একটি প্রকৃত স্বাধীন দেশের যেসব বৈশিষ্ট্যাবলী থাকা অপরিহার্য, অনেকাংশেই বাংলাদেশের তা নেই। এখন এদেশের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলতে যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা জাতিসংঘের একটি সদস্যপদ, একটি পতাকা আর কাঁটা-তারের বেড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এগুলো উপড়ে ফেলে সিকিম ভূটানের মতো 'মহাভারতের সাগর তীরে লীন' হয়ে যাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ প্রক্রিয়াকে জোরদার করার জন্যই রাজনৈতিক কারণেই রবীন্দ্রনাথকে এ দেশের আনাচে-কানাচে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে চলেছে তার বন্দনা। অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্যই দেশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম বিটিভিতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে অপাংক্তেয় করে তোলা হলেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কোরাস চলছে জোরে সোরে। বিটিভির প্রতিটি অনুষ্ঠানেই থাকছে রবীন্দ্রসংগীত কিংবা রবীন্দ্রনাথের বাণী।"

[মাসুদ খন্দকার ঃ রবীন্দ্র স্তুতি, দৈনিক সংগ্রাম, ৩০শে মে ১৯৯৭]

এ প্রসংগে গত ১৮ ই মে'৯৫ দৈনিক সংগ্রামে আসিফ আরসালান লেখেন ঃ

"নয় বছর আগে যখন অত্যন্ত ঘটা করে জাঁকজমকের সাথে ১৪০০ সালের আগমনী উদযাপন করা হয়েছিলো। তখন দুই বাংলার ঐক্য এবং অভিন্নতার প্লাবন বয়ে গিয়েছিলো। দুই বাংলার ভাষা এবং সংস্কৃতির ঐক্য এবং সেই সুবাদে দুই বাংলার অভিন্নতার জয়ধ্বনি বাংলাদেশেও উচচারিত হচিছলো। বাংলাদেশ টেলিভিশন তো আগ বাড়িয়ে একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান প্রচার করেছিলো। অনুষ্ঠানটির শিরোনাম ছিলো 'শতাব্দীর প্রান্তে দাঁড়িয়ে'। এই অনুষ্ঠানে দুই বাংলার অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিকে এক সূত্রে গ্রথিত করার জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রাণান্ত প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু এর প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বেই ১৯৪৭ সালে অভিন্নতার তানপুরাটা ভেঙ্গে গেলো কেন? তার ২৬ বছর পর ১৯৭১ সালে তানপুরার সেই ছেঁড়া তারগুলো জোড়া লাগলো না কেন? অথচ '৭১ বা '৪৭ এরও অনেক আগে কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

"বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।।

কবির এমন উদাত্ত আহবান সত্ত্বেও বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন এক হয়নি। '৪৭ সালে যদি কোনো নেপথ্যচারীর ক্রুর চক্রান্তে বাংলার

www.pathagar.com

হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন করা হয়েও থাকে তাহলে '৭১ সালে সেই ছিন্ন তন্ত্রী এক হলো না কেন? '৭১ সালের পর '৯৩ সাল (১৪০০ সাল) এই সুদীর্ঘ ২২ বছরেও সেই হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন রয়ে গেলো কেন? দুই হৃদয়ের ছিন্নপত্র জোড়া লাগেনি এই কারণেই যে, অনেক আগেই তারা তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'গীত বিতান'-এর ৫৬৮ পৃষ্ঠায় সাত নম্বর সঙ্গীতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্থির অচঞ্চল কণ্ঠে গীত হয়েছে ওপার বাংলার শেষ এবং চূড়ান্ত গন্তব্য ঃ

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন
বন্দে মাতরম।।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা -ঝঞ্ঝায়
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছাড়িব কভু এ দৃঢ় বন্ধন
বন্দে মাতরম।।

'বন্দে মাতরম' অর্থ কি? ঢাকার বাংলা একাডেমীর Bengli English Dictionary-এর ৫০৩ পৃষ্ঠা মোতাবেক অর্থ হলো I Salute thee mother অর্থাৎ 'ওমা তোমায় করি নমস্কার'। এই মা এখানে মাতৃভূমি। কোন মাতৃভূমি? সেই ঘোষণাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় গীতবিতানের ১৭৬ পৃষ্ঠায়ঃ

"হে মোর চিত্ত পূণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শক-হুন-দল পাঠান-মোঘল এক দেহে হল লীন।"

সুতরাং সেই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে সব কিছুই যে লীন হয়ে যাবে তাতে আর অবাক হওয়ার কি আছে? ঋষি বঙ্কিমের জাতীয় শ্লোগান "বন্দে মাতরম"!

গীত বিতানের স্বদেশী সংগীত 'বন্দে মাতরম'। আনন্দবাজার প্রত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভের শীর্ষদেশে উৎকীর্ণ 'বন্দে মাতরম'। এই দুই বাংলার মিলন মেলায় বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাড়িয়ে আছে ঐ দুটি শব্দ, যা একশত বছরের অতি প্রাচীন অতি পুরাতন।

অভিভক্ত বাংলায় সকলের মুখে মুখে ছিলো নজরুলের গান। বিশ ও ত্রিশের দশকে নজরুলের গান না হলে সিনেমা-থিয়েটার চলতো না। রবীন্দ্রসংগীতের কোনো চাহিদা ছিলো না। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'মি. রেজাউল করিম'দের আবির্ভাব ঘটায় বিটিভি নাটকে নজরুল সঙ্গীত নিষিদ্ধ, অবশ্য অঘোষিত।

www.pathagar.com

শুধু রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নাটকের যেখানে-সেখানে রবীন্দ্র সংগীত ঢুকিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে জনপ্রিয় করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে। নজরুলের ব্যাপ্তী বেশী হওয়া সত্ত্বেও নজরুলের নাম নেই। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের মতো সিনেমায় অভিনয় করেননি বা দেশের জন্য জেলও খাটেন নি। {সাহিত্যিক মঈনুদ্দীন হোসাইন সাহেবের ভাই মি. রেজাউল করিম। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় আনন্দমঠের গুণকীর্তন করে মুসলমানদেরকে সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এ কাজের পুরস্কার স্বরূপ তিনি নাকি কোনো মহল থেকে প্রচুর অর্থলাভ করে বেকারত্ব ঘুচিয়েছিলেন।"-আবুল কামাল শামসুদ্দীন ঃ অতীত দিনের স্মৃতি ঃ পৃ.১৭৮}

বাংলাদেশের বিশিষ্ট নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ "নজরুল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেছিলেন" শীর্ষক প্রবন্ধে *(দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, শুক্রবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮)* লিখেছেনঃ

"এই কারণেই নজরুলকে পড়ার পর বুদ্ধদেব বসুর মনে হয়েছিল-"এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অভাববোধ জেগে উঠলো-বন্ধ্যা প্রাচীনের সমালোচনার ক্ষেত্রে নয়, অর্বাচীনের সৃষ্টির ক্ষেত্রেই। মনে হলো, তার কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই,সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হলো তার জীবন-দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।...

আর একটা দিকে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেছিলেন। ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায় বা জাতি হিন্দু ও মুসলমান বা মুসলমান ও হিন্দু। নজরুল এই প্রধান দুই জাতির সংস্কৃতিকে কাব্যে উপস্থাপন করতে, তাদের হৃদয়ের আশা আকাংখাকে মর্যাদা দিতে, তাদের ধর্মানুভূতিকে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তা পারেননি। সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্ন তুললে তা নজরুলের বেলাও প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যে বাঁধার প্রাচীর রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করতে পারেননি নজরুল তা পেরেছিলেন; বরং যে কঠিন অনুশাসন ব্রাহ্ম-রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভাঙ্গা সহজ ছিল, মুসলিম নজরুলের পক্ষে তা ছিল আরও কঠিন। কিন্তু নজরুল তা দুর্দান্ত সাহসে অতিক্রম করেছেন। বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সে সাহসের পরিচয় দিতে তিনি দ্বিধা করেননি। নিজের সমাজের সামাজিক সংস্কারের অনুশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি সেই একই সাহসের পরিচয় দিয়েছেন- যে জন্য তার ভাগ্যে জুটেছিল কারাগার ও 'কাফের' ফতোয়া। এই অভ্রংলিহ সাহসিকতায় যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে ছিলেন সে কথা উচচারণে দ্বিধা থাকারও কারণ দেখি না।

কৃষ্ণ দত্ত এবং এনড্রিউ রবিনসন রচিত Rabindranath Tagore : The Myriad - minded Man' নামক গ্রন্থে এক চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। ঘটনাটি ১৯১৩ সালের। রবীন্দ্রনাথ যখন তৃতীয় বারের মতো ইংল্যান্ড সফর সমাপ্ত করে স্বদেশ ফেরার আয়োজন করেছিলেন, তখন সেখানে তার দু'জন বন্ধু ও শুভাকাংখী শিল্পী উইলিয়াম রথেনষ্টেইন ও কবি ইয়েটস তার সম্মানে এক নৈশভোজের ব্যবস্থা করেন। আহারান্তে তারা রবীন্দ্রনাথকে 'বন্দে মাতরম' গানটি গাইতে বলেন। দত্ত ও রবিনসনের মতে, রবীন্দ্রনাথ গান শুরু করেন বটে কিন্তু গানের শব্দগুলো তিনি সব মনে করতে পারলেন না।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার প্রাক্কালে ইংরেজ কবি ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সে সময় তার প্রতি যথেষ্ট উচ্চাশা পোষণ করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তার এ ধারণা পরিবর্তিত হয় এবং তা কতটা বিরূপ ও খারাপ ছিলো তা তাঁর ১৯৩৫ সালের লেখা থেকে বোঝা যায়। ইয়েটসের ধারণা এতোটা পরিবর্তিত হবার পেছনে কোনো বিশেষ কারণ ছিল কিনা জানিনা। কিন্তু এটা ঠিক যে, ইয়েটসের ধারণার সাথে সম্পূর্ণ একমত হওয়া চরম রবীন্দ্রবিরোধী ব্যক্তির পক্ষেও হয়তো সম্ভব নয়।

কবি ইয়েটসের কথায় অবশ্যই কিছুটা বাড়াবাড়ি আছে। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে একজন বড় কবি ছিলেন। তাছাড়া যদিও রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী পড়ার জন্য এবং দ্বিতীয়বার ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন কিন্তু কোনোটাই শেষ করতে পারেন নি, তবু তিনি ইংরেজী জানতেন না, একথাটির মধ্যে অবশ্যই অতিশয়োক্তি রয়েছে। তবে ইংরেজদের মতো ইংরেজীতে চিন্তা-কল্পনার স্ফুরণ ঘটানো অইংরেজদের পক্ষে দুষ্কর বৈকি। মহাকবি মধুসূদনের মতো কালজয়ী প্রতিভার পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি। এটা আমরা সকলেই অবগত।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি সম্পর্কে আর একটি কথা থেকে যায়। 'গীতাঞ্জলী' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু সবাই জানেন, এটা তার শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়। ইতোপূর্বে রচিত তার 'মানসী', 'বলাকা', 'চিত্রা' ইত্যাদি কাব্য এর চেয়ে অধিকতর উন্নত মানের। তবে 'গীতাঞ্জলী' কাব্যে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ বা অনুগত প্রাণের নিবেদিত চিত্ততার যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে ইংরেজ প্রভূদের নিকট তার হয়তো একটি আলাদা মূল্য ও গুরুত্ব থাকতে পারে। সে সময় বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের অংশ হিসেবে হিন্দুদের মধ্যে বিলেতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। ভারতীয় মুসলমানগণও ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন করে আত্মসচেতন ও অধিকার সচেতন হয়ে উঠে। এ সময় ইংরেজ প্রভূদের নিকট অনুগত প্রাণের কদর ছিলো বেশী। হয়তোবা এ কারণেই এ কাব্যটির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিকে এতোটুকু খাটো করে দেখা সঙ্গত নয়, বরং এজন্য আমরা যথার্থই গর্ববোধ করতে পারি। তবে প্রসঙ্গত এসব কথার অবতারণা এ জন্য যে, নোবেল পুরস্কারের

www.pathagar.com

মতো সম্মানজনক পুরস্কারও সর্বদা নিরেপক্ষ মানদন্ডে বিচার করা হয় না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও গোষ্ঠিগত চিন্তা এ পুরস্কার বিতরণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন, ব্যাক্তিত্ব ও সাহিত্য সে প্রভাব বলয়ের মধ্যে পড়ে বলেই এমন কথা মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারে। নইলে রবীন্দ্রনাথ যে নোবেল পুরস্কার লাভের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন তাতে সন্দেহের এতোটুকু অবকাশ কোথায়?

[অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিয়ার রহমান ঃ বিশ্বকবি, নোবেল পুরস্কার ঃ জাতীয় কবি ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ২২শে মে ১৯৯৮]

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষা রপ্ত করেছিলেন এবং ইংরেজী সাহিত্যের গভীর অনুরাগী পাঠক ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ন্যায় তার এ ইংরেজী ভাষা সাহিত্য পাঠ বাংলা সাহিত্যের অনেক সমৃদ্ধি সাধনে সহায়ক হয়েছে। মধুসূদন যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের অনুসরণে নাটক, প্রহসন, মহাকাব্য, সনেট লেখেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথও বিশেষত ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ইংরেজী সাহিত্যের অনুসরণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাসের আত্যন্তিক বিকাশ ঘটেছিলো সত্য। কিন্তু মানুষের মনোবিজ্ঞান বিশ্লেষণের যে ধারা এবং আধুনিক উপন্যাসের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম শিল্প কৌশল রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যেভাবে এসেছে তা নিরতিশয় বিস্ময়কর। এছাড়া বাংলা ছোটগল্পের তিনিই তো স্রষ্টা এবং সফলতম শিল্পী। অবশ্য এক্ষেত্রেও সমালোচনার তীক্ষ্ণ ছুরি রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বকে কিছুটা ম্লান করে দিয়েছে। তাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথের দু'একটা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং বেশ কিছু সংখ্যক সফল ছোট গল্প হুবহু ইংরেজী উপন্যাস ও ছোট গল্পের অনুবাদ বা অনুসরণ। সমালোচকদের বড় আপত্তি হলো, রবীন্দ্রনাথ তার ঋণ কোথাও কোনোভাবেই স্বীকার করেননি। স্বীকার করলে আপত্তির অবকাশ থাকতো না। কিন্তু স্বীকার না করাতেই যতো বিপত্তি। ফলে অনেক সমালোচক তাকে চৌর্যবৃত্তির অপরাধে অপরাধী বলেও কঠোর সমালোচনা করেছেন। এ অভিযোগ তার কতিপয় বিশেষ কবিতার ক্ষেত্রেও উঠেছে। বলা হয়ে থাকে, এগুলো বিশিষ্ট ইরানী কবিদের ফারসি কবিতার অনুবাদ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রেও তার ঋণ স্বীকার করতে কার্পণ্য করেছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল, ছোট গল্পে সুনিপুণ কারিগর, উপন্যাসে অনন্য, সংগীতে অসাধারণ। রবীন্দ্র সাহিত্য বাংলা সাহত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার। এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। তবে ভক্তির আতিশয্যে রবীন্দ্রনাথকে যারা দেবতার আসনে বসিয়ে পূজার নৈবেদ্য অর্পণে ব্যস্ত তারা আসলেই বাড়াবাড়ি করছেন। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কবি নন, তারপরেও জাতীয়ভাবে রবীন্দ্রবার্ষিকী পালনের প্রথা বাংলাদেশে

www.pathagar.com

চালু করা হয়েছে। কেন করা হয়েছে তার পরিস্কার ব্যাখা নেই। পশ্চিমবঙ্গে নজরুল বার্ষিকী পালন করা হয়না। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ভাবে বিজ্ঞপ্তি মারফত ঘোষণা দিয়েছে নজরুল বার্ষিকী পালিত হবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ পর্যন্ত নজরুল রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ নেয়নি। নজরুল পশ্চিমবঙ্গের স্কুল-কলেজের পাঠ্য-সিলেবাসেও নেই। বাংলাদেশ টেলিভিশনে রবীন্দ্রভক্তির যে আতিশয্য শুরু হয়েছে তাতে রবীন্দ্রনাথকে বিতর্কিত করে ফেলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশের মানুষ একজন বিরাট কবি হিসেবে জানে। কিন্তু বাংলাদেশ টেলিভিশন রবীন্দ্রনাথকে নতুন রঙ্গে রঞ্জিত করার চেষ্টা করেছে।

কলিম শরাফী বলেছেন, আমাদের জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথকে যথাযথ মর্যাদা দেয়া হচ্ছে না। ড. নীলিমা ইব্রাহীম বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে প্রতিপক্ষ করে নজরুলকে দাড় করানো হলো জাতীয় কবিরূপে। বাংলাদেশের খ্যাত 'নারী কবি' সুফিয়া কামাল অবেগের আতিশয্যে বলেছেন, রবীন্দ্রসংগীত চর্চা হচ্ছে এবাদত সমতুল্য। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শন পর্যালোচনা করলে কি দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেও পূর্ব বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধী ছিলেন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে ১৯০৫ সালে যে বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিলো, সে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ আদা-পানি খেয়ে নেমেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতা করে তিনি বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের স্বার্থ-পরিপন্থী কাজ করেন। এরপরও রবীন্দ্রনাথকে বন্দনা করা হচ্ছে-'বিদ্বেষ দূরীকরণের কবি', 'সন্ত্রাস নির্মূলের কবি', 'শান্তি প্রতিষ্ঠার কবি' হিসেবে। যে যেখানে আছে তাকে সেখানেই রাখা উচিত। নিরাবেগে রবীন্দ্রনাথকে মূল্যায়ন না করে অস্তিত্বহীন গুণাবলী আরোপ করলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসবে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালীন রচিত বিখ্যাত 'আমার সোনার বাংলা' গানটিও বিতর্কের বাইরে থাকবে না।

রবীন্দ্রাথ ঠাকুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে তার অবদান সর্বোচেচ। বাংলাদেশের সাহিত্যে ও শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দখল স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয় ও নন্দিত। বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে বাংলা সাহিত্যকে সমহিমায় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী। একজন ভিনদেশী কবি বা সাহিত্যিককে এতো মর্যাদা অন্যদেশ তাকে যেভাবে দিয়েছে এটা বিরল। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় কবি। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত তারই লেখা। অথচ তিনি ভারতের জাতীয় কবি নন। ভারতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু হলেও ভারতে তার জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকী জাতীয় ভাবে পালিত হয় না। ভারত যা করে না আমরা বাংলাদেশে তা করি। ইতিহাসের ধারবাহিকতা, জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সম্প্রদায় স্বার্থ, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক

www.pathagar.com

বিশ্বাস কোনো ব্যাপারেই রবীন্দ্রনাথের সাথে বাংলাদেশের মানুষের কোনো মিল নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ যা নয় আমরা তাই বলি। আমরা বলি রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব, বলি এই বাংলাদেশ একদিন 'রবীন্দ্র বাংলা' হবে। রবীন্দ্রের জন্মদিন বাঙ্গালী জাতিরই জন্মদিন। আরও বলি রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় অনুপ্রেরণার উৎস। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথকে এভাবে দেখা ও বিবেচনা করা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, দুঃখ জনক।

রবীন্দ্রনাথ তার কাব্য সাহিত্যে বেদ-বেদান্ত তথা হিন্দুধর্মের বাণী ও মূল্যবোধই তুলে ধরেছেন। তার ঐতিহ্যের উৎস হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্র। ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানরা তার সাহিত্যে স্থান পায়নি। কাজী নজরুল ইসলাম যেমন মুসলমানদের জন্য অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি অন্যান্য সম্প্রদায়কেও এড়িয়ে যাননি। রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যকর্মে যে বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তা বাংলাদেশের নব্বুই শতাংশ মানুষের বিশ্বাস, আচার ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে 'শ্রীপদ্ম' প্রণয়নে মুসলমান ছেলেদের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে মুসলমান ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন, তারা ধর্মে ইসলাম অনুসারী হলেও জাতিতে তারা হিন্দু অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান! কাজী নজরুল ইসলাম রক্ত না লিখে খুন কেনো ব্যবহার করেন, এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিরূপ মন্তব্য করেন। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে নজরুল বলেন, "আমি শুধু খুন নয়, বাংলায় চলতি আরও অনেক আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছি।...আমি মনে করি বিশ্ব কাব্য-লক্ষ্মীরও একটা মুসলমানী ঢং আছে।...বাংলা কাব্য-লক্ষ্মীকে দুটো ইরানী জেওর পরালে তার জাত যায় না। বরং তাকে আরও খুবসুরতই দেখায়। আজকের কলালক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলংকারই মুসলমানী ঢং-এর। যে খুনের জন্য কবিগুরু রাগ করেছেন তা দিন রাত ব্যবহার হচ্ছে...। এবং তা খুন করা খুন হওয়া ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপার নয়।'

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ মুসলমানী শব্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন বলে আওয়ামী সরকারও আরবী-ফার্সি শব্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, আর তাই 'জিন্দাবাদের' স্থলে 'দীর্ঘজীবী', 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমে'র স্থলে 'পরম করুণাময় আল্লাহর নামে', 'মরহুম' স্থলে 'প্রয়াত' পরিবর্তনের হিড়িক পড়ে গেছে। এ সত্যকে স্বীকার করতেই হয় যে, রবীন্দ্র সাহিত্যে 'আপা' স্থান পায়নি 'দিদি' আছে, 'চাচা' নেই 'কাকা' আছে, 'খালা' নেই 'মাসী' আছে। 'মসজিদ' নেই 'মন্দির' আছে, 'ইমাম' নেই 'ঠাকুর' আছে, 'খাদেম' নেই, 'গোঁসাই' আছে। নাটকে সঙ্গীত প্রয়োজনেই থাকবে তবে আপত্তি সঙ্গীত নির্বাচনে। নজরুলের বিশাল সঙ্গীত ভাণ্ডার থাকতে তাকে উপেক্ষা করে নিরংকুশ পছন্দ হচেছ রবীন্দ্র

www.pathagar.com

সঙ্গীত। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র সঙ্গীত আছে ২২৩২ টি আর নজরুল সঙ্গীত ৩০০০ এর উপর। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী গানের রেকর্ডের অধিকারিণী ভারতীয় সংগীত তারকা আশা ভোসলে বলেছেন, "নজরুল সংগীত রবীন্দ্র সংগীতের চেয়ে বহু উন্নত মানের... যারা গাইতে জানে না তাদের জন্য রবীন্দ্র সংগীত আর যারা গাইতে জানেন তাদের জন্য নজরুল সঙ্গীত।" এরপরও এরূপ একপেশে মনোভাব নিন্দার্হ এবং বাড়াবাড়ি।

[মু. নওশের আলী ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মূল্যায়ন ঃ সোনার বাংলা, ঢাকা, ৭ই মে ১৯৯৮]

জাতীয় পর্যায়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৩৭- তম জন্মবর্ষিকী উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বলেন, "আমরা মহান রবীন্দ্র সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।" এটি সরকারী ঘোষণা। অনুষ্ঠানটিই সরকারী। প্রশ্ন হলো, পৌত্তলিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী মুসলমান হয় কি করে? রবীন্দ্রনাথ প্রচারে ব্রাহ্ম কিন্তু প্রকারে ব্রাহ্মণ। তিনি দেবী কাত্যায়নীর (কালী ঃ শক্তি ও সংহারের দেবী) পূজা মহা ধুমধামের সাথে করতেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিল্পপতি অধ্যাপক ড. মযহারুল ইসলাম (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর) লিখেছেন ঃ

"শান্তিনিকতনে রবীন্দ্রনাথ পৌষ মেলার প্রবর্তন করেন ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বরে। তারই অনুসরণে শিলাইদহে স্থানীয় দেবী কাত্যায়নীর পূজা উপলক্ষে ১৯০২ সালে ১৫ দিনব্যাপী স্বদেশী মেলার প্রবর্তন করেন, যেখানে লাঠিখেলা ও যাত্রাভিনয় প্রাধান্য পায়। ওই মেলাতেই রাখীবন্ধন ব্যবস্থাও চালু করা হয়।"

[মযহারুল ইসলাম ঃ কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ ঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২রা জৈষ্ঠ ১৩৯৭]

অধ্যাপক ড. মযহারুল ইসলামের উক্তি "এই মেলাতেই রাখীবন্ধন চালু করা হয়" লক্ষণীয়। বাংলাদেশে ১৯৯৮ সালে সেই রাখীবন্ধন ব্যবস্থা চালু করলেন কবি শামসুর রহমান, অবশ্য বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই। সেই উদ্দেশ্য আঁচ করে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকররমের খতিব মওলানা উবায়দুল হক তখন এক খুতবায় বলেন ঃ

"রাখীবন্ধন, উলুধ্বনি, বাসন্তী শাড়ী পরে নাচ-গান, অঙ্গভঙ্গি দেয়া, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো ইত্যাদি মুসলমানের সংস্কৃতি নয়। এটা কাফের, মুশরিক, মুজুসীদের সংস্কৃতি। এ থেকে বিরত থেকে মুসলমানদের নিজস্ব তাহজীব তামুদ্দুনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নতুবা একদিন বিজাতীয় সংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে আমাদের সংস্কৃতির সাথে সাথে ঈমানদারিত্ব এবং মুসলমানিত্বও হারিয়ে যাবে।"

www.pathagar.com

মুসলমানিত্ব হারিয়ে যাওয়া মানে বাংলাদেশ হারিয়ে যাওয়া। এদেশে ইসলাম যতোদিন টিকে থাকবে ততোদিন এদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকে থাকবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ইসলামকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্যা শ্রীমতি মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত বুদ্ধিজীবি মহলে বহুল সমাদৃত 'নবজাতক' পত্রিকায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের নয়াদিল্লী থেকে রেবতী ভূষণ ঘোষ কলকাতায় মৈত্রেয়ী দেবীর নিকট একটি পত্র দেন। পত্রটি 'নবজাতক'-এ প্রকাশিত হয়। তার অংশবিশেষ, "আমাদের মাতৃভাষায় কী যাদু তিনি সঞ্চারিত করে গেছেন যার শক্তিতে একটা গোটা জাতি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো জীবন বাজি রেখে। অমন যে ইসলামী তমদ্দুনের ভ্রূকুটি তাও তুচ্ছ হয়ে গেল।... কিন্তু ওরা কাব্য সংগীত দর্শন সব মিলিয়ে গোটা রবীন্দ্রনাথকেই মনে হয় আত্মসাৎ করে নিল।" *(ডাকঘর ঃ নবজাতক (কলকাতা), স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যা)*

রবীন্দ্রনাথই মনে হয় আমাদের আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। তাকে নিয়ে যে হারে মাতামাতি করা হয় তাতে মনে হয় রবীন্দ্রসনাথের অস্তিত্বই যেন আমাদের অস্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথের মোকাবেলায় "অমন যে ইসলামী তমদ্দুনের ভ্রূকুটি তাও তুচ্ছ হয়ে গেল"-রেবতী ভূষণ ঘোষের এ দাবী যথার্থ বলতে হয়। আর তাই আওয়ামী সরকারের স্পীকার দাবী করেন "আমরা মহান রবীন্দ্র সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।" তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বলে থাকেন-"বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস রবীন্দ্রনাথ।" জ্ঞানপাপী আর কাকে বলে?

রবীন্দ্র সংস্কৃতি আমাদের কলেজ ছাত্রীদের শেষপর্যন্ত ফ্যাশন-শোর (সুন্দরী প্রতিযোগীতার প্রথম পদক্ষেপ) দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদটি তুলে ধরা হলো ঃ

"ব্যাতিক্রমী এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে মেতেছিল ইডেন ক্যাম্পাস"

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বর্ষবরণ ও রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে শনিবার এক ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানে মেতে উঠেছিল ইডেন কলেজের ছাত্রীরা। শিক্ষিকারাও সাথে। অনুষ্ঠানমালায় ছিল নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, নাটক, বক্তৃতা ও ফ্যাশন শো। ইডেন কলেজ ক্যাম্পাসে এত সুন্দর অনুষ্ঠান নিকট অতীতে আর হয়নি এ অভিমত প্রকাশ করলেন কয়েকজন শিক্ষিকা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অন্যতম আকর্ষণ ছিল বর্ণাঢ্য মেলা। বিভিন্ন আইটেমের খাবার, সালোয়ার, কামিজ, ওড়না ও কসমেটিক দিয়ে সাজানো হয় ৩০টি স্টল। এর মধ্যে শিক্ষিকাদের স্টল একটি, নাম 'ষড়রঙ্গ'। বাকী স্টলগুলো ছাত্রীদের। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি শামসুর রহমান। তিনি বলেন, বর্ষবরণের চেতনা অসাম্প্রদায়িক। এ অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করে উৎসবের মাধ্যমে অসুন্দর ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তিনি

www.pathagar.com

ছাত্রীদের প্রতি আহবান জানান। আলোচনা সভায় অংশ নেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ জাহানারা হক, অধ্যক্ষ ড. আয়েশা খাতুন, বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান চেমন আরা, উপাধ্যক্ষ পেয়ারী আখতার ও কলেজ শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা রশিদ।

এদিকে অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিচিত্র সাজে সেজেছিলেন কলেজের ছাত্রীরা। গোটা কলেজ ক্যাম্পাস ছাত্রীদের পদচারণায় হয়ে উঠেছিল মুখর। বাংলা বিভাগের ১৪ ছাত্রীর সাজগোজ ছিল চোখে পড়ার মত। তারা প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ঐতিহ্য ধারাবহিকভাবে নারীদের উপস্থাপন করে। বাংলা বিভাগের শিক্ষিকা দিলারা হাফিজ জানালেন, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীদেরও পরিবর্তন হয়েছে। জমিদার আমলে নারীরা ছিল এক রকম। জমিদাররা একাধিক স্ত্রী ও দাসী রাখতো। মোড়লরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতো। কর্মজীবী মহিলাদের আচার-আচরন একরকম, আবার গৃহিণীদের রূপ ও সাজসজ্জা অন্যরকম। দিলারা হাফিজ জানান, ঐতিহ্যগতভাবে নারীদের এসব রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে ১৪ ছাত্রী। এদিকে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের ১৪ ছাত্রী বিভিন্ন ফল দিয়ে অলঙ্কার তৈরী করে।"

(দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, রবিবার, ১০ মে ১৯৯৮)

ঈদের খুশীতেও ইডেন ক্যাম্পাস ততো উদ্বেলিত হয়ে উঠে না, যতোটা হয়েছে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে। পৌত্তলিক রবীন্দ্রনাথ মহাধুমধামের সাথে শিলাইদহে দেবী কাত্যায়নির (কালী) পূজা দিতেন। মুসলমান প্রজাদের বাধ্য করতেন পূজোয় চাঁদা দিতে। তারা নারী প্রতিমাপূজ্ঞে পূজায় শরীক হতে চায়নি। কারণ আল কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে ঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেন না এবং এ ছাড়া যাকে ইচছা ক্ষমা করে থাকেন এবং যে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করে, তবে নিশ্চয়ই সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে। ওরা তাকে পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে নারী প্রতিমাপুঞ্জকেই আহবান করে এবং তারা বিদ্রোহী শয়তানকে ব্যতীত আহ্বান করে না।" *(নিসা ঃ ১১৬-১১৭)* -

আল কুরআনে নারী প্রতিমাপূঞ্জকে আহবান না করার জন্য বলা হয়েছে অথচ রবীন্দ্রনাথ সেই নারী প্রতিমাপুঞ্জকেই আহবান করতেন। জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত তিনি নারী প্রতিমা পূজাকেই আহবান করে গেছেন। তার জীবনের সর্বশেষ কবিতা ১৯৪১ সালের ৩০ শে জুলাই সকাল ৯টায় অপারেশন টেবিলে যাবার আগে তিনি রচনা করেছিলেন। *'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ অ কীর্ণ করি বিচিত্র ছলনা ছলে হে ছলনাময়ী'।* তিনি মুখে মুখে বলে যান। লেখেন রানীচন্দ্র। তাকে বলেন, 'কিছু গোলমাল আছে, পরে ঠিক করব খন।' কিন্তু সেই পরে আর তার জীবনে আসেনি। অপারেশনের ফলে তিনি মারা যান।

www.pathagar.com

জর্জ বার্ণার্ড শ' নিজেকে সব সময় সবার উপরে মনে করতেন, কখনও কোনো অবস্থায় কারো নিকট নতি স্বীকার করতেন না। সেই বার্ণার্ড শ' একবার সর্বসমক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, "আপনাকে দেখে আমার খুব হিংসে হয়।" শুনে রবীন্দ্রনাথ বর্তে গেলেন, আমতা আমতা করে বললেন, "কী যে বলেন?" রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন তাঁর প্রতিভার কথা হয়তো বলছেন বিশ্বের সেরা সাহিত্যিক। কিন্তু তাঁকে একেবারে নিরাশ করে জর্জ বার্ণার্ড শ' বললেন, "আপনার দাড়িটা আমার দাড়ির চেয়ে বড়।" দুঃখের বিষয় সেই দাড়িটাও তিনি চিতায় উঠার পূর্বে হারালেন। জনতার এতোই রবীন্দ্রানুরাগ যে, স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে তার মাথার চুল ও মুখের দাড়ি সব উপড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চুল-দাড়ি বিহীন রবীন্দ্রনাথ কতোখানি কদাকার হতে পারেন অনুমান করা যায়। সুন্দরের সাধকের শেষে এই পরিণতি।

যদিও কবি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী মুসলমানদের জীবন কাহিনী নিয়ে কিছু লেখার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার অবকাশ পাননি তবুও তিনি যেহেতু আধুনিক বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠা দানকারীদেরই একজন এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সে কারণে প্রতিটি শিক্ষিত মুসলিম পরিবারে তার রচিত সাহিত্য ও সঙ্গীত শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে। রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী পালনে এদেশের মানুষ কোররূপ হীনমন্যতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। এই দেশের ইসলামী আন্দোলন মূলতঃ রবীন্দ্রবিরোধী নয়। তবে তারা ব্যক্তিপূজার ঘোর বিরোধী হওয়ায় রবীন্দ্রপূজারও বিরোধী। রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চা এক কথা, কিন্তু কবিকে দেবতার আসনে বসিয়ে তার কাছে অর্ঘ নিবেদন করা হলো এক ধরনের পৌত্তলিকতা। আমাদের দেশ ও জাতি পৌত্তলিকতা প্রশ্রয় দিতে পারে না। অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই, রবীন্দ্রসাহিত্য ও কাব্য এখন আর ইউরোপীয় বিদ্বান সমাজে কোনো কৌতুহল জাগায় না। টলষ্টয়, সেক্সপীয়ার বা গ্যেটে যে অর্থে সাধারণভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক সে অর্থে রবীন্দ্রনাথ প্রায় বিস্মৃতই বলা চলে।

বাঙ্গালী মুসলমানের কাছে রবীন্দ্রনাথ কৌতুহল সৃষ্টি করেন, কারণ রবীন্দ্রনাথ ও তার রচনার বিরাট অংশ জুড়ে আছে এক ধরনের একেশ্বরবাদিতা। তিনি হিন্দু ধর্মের বদলে ব্রাহ্মধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য তার ব্রাহ্মধর্ম ছিলো হিন্দু ধর্মকে উৎকর্ষ রূপ দেবার জন্যই। মোট কথা, তিনি নাস্তিক ছিলেন না। ফলে এ দেশে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী সরকারী ভাবে পালনে আমরা কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখতে পাই না। এই বাধা না থাকার ফলে এ দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বড়ই অস্বস্তির মধ্যে আছেন বলে মনে হচ্ছে। তাদের ধারণা এ দেশের ও বিশ্বের সব ইসলামী আন্দোলন রবীন্দ্র বিরোধী।

১৯৯৮ সালে সরকার কর্তৃক রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে যে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে সেখানে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কবীর চৌধুরীর একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। সেখানে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে

www.pathagar.com

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনকে কটাক্ষ করা হয়েছে। কবীর চৌধুরীদের নিজের অতীতের দিকে তাকানো উচিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার যে ভূমিকা ছিলো, বর্তমান বক্তব্যের সাথে তা কি সঙ্গতিপূর্ণ?

রবীন্দ্রসাহিত্য ও সঙ্গীত বাংলাদেশের মুসলমানদের-শুধু মুসলমানদের কথাই বা বলি না কেন, বাংলাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধদেরও যুগের দাবী পূরণের উপযোগী নয়। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে বহু দূরে এগিয়ে এসেছে। পেছনে ফেরার আর কোন সম্ভাবনা নাই। কবির চৌধুরীরা বৃথাই বিষোদগার করে চলেছেন।

এদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. আহমদ শরীফ লিখেছেন,

"রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর চুয়াল্লিশ বছর অতিক্রান্ত। আজো কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে গুরুদেব আর সাধারণ অসাধারণ পাঠক ভক্তদের কাছে কবিগুরু। দুটোরই ব্যবহার তাৎপর্যহীন, তাই অসঙ্গত। কেননা যারা পড়েনি তার কাছে এবং দেখেনি তাকে তাদের মুখে গুরুদেব নির্বোধের অর্থহীন অন্ধভক্তির সাক্ষ্য মাত্র; আর কবিগুরু যদি হয় কবির গুরু নির্দেশক, তাহলে তাও হয় ন্যায়বুদ্ধিরিক্ত স্থূল রুচি অক্ষম ভক্তের অপপ্রয়োগ। আর অংকের স্যার, ইংরেজীর স্যার প্রভৃতির মত গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামের শিক্ষককে যদি শিক্ষার্থীরা কবিগুরু নামে নির্দেশ করে থাকে, তাহলে শিক্ষকতা ত্যাগের পরে কিংবা মৃত্যুর পরে তাকে এ পরিভাষায় তথা যোগরূঢ় শব্দে চিহ্নিত করা অসঙ্গত বলেই অবাঞ্ছিত। প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ভক্তি-আসক্তি প্রভৃতি অন্ধ আবেগ-প্রসূত বলে যে কথা চালু আছে, এ তারই প্রমাণ।"

জাতি তার ঐতিহ্যকে নিয়ে বাঁচতে চায়। যে জাতির উদাহরণ দেয়ার মতো কোনো বাস্তব ঐতিহ্য নেই, সেই জাতি কাল্পনিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করে নেয়। যে জাতির ইতিহাসে উদাহরণ দেয়ার মতো কোন বীর জন্মায়নি, সেই জাতি কল্পনার রং লাগিয়ে বীর মূর্তি গড়ে নেয়। যেমন ভারতীয় জাতির জীবন্ত কোনে ঐতিহ্য নেই। রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত যেসব বীরের ঐতিহ্য নিয়ে তারা গর্ব করেন সেগুলোর সবই কাল্পনিক। মহাবীর রাম,পবনপুত্র হনুমান, শ্রীকৃষ্ণ কিংবা সূর্যসন্তান কর্ণ বা মহাবীর অর্জুন কেউই পৃথিবীতে জন্মায়নি বা বাস্তবে ছিলেন না। সকলেই কল্পনার তুলিতে আঁকা বীর পুরুষ। বাস্তবতাহীন কল্পনা তো সবার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তাই জাতীয় বীর সৃষ্টির তাগিদে তারা শত শত বছর ধরে হন্যে হয়ে ঘুরেছে। তারা পর্বত মুষিক শিবাজীকে জাতীয় বীর আখ্যায়িত করতে কম চেষ্টা করেনি।

দাক্ষিণাত্যের সুলতানের জায়গীরখোর মারাঠা দলপতির পুত্র শিবাজী, যিনি লুট-তরাজ ও তস্কর বৃত্তি দস্যুতার জন্য দেশে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। কোনো অজানা পল্লীবালা "ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে" গান গেয়ে এই বর্গীদস্যুর ভয় দেখিয়ে ছেলে ঘুম পাড়াতেন, সেহেন তস্করকেও জাতীয় বীর সাজাতে

www.pathagar.com

গিয়ে বহু শিবাজী উৎসব করতে হয়েছে, বহু গৈরিক পতাকার গান গাইতে হয়েছে। অতবড় যে কবি রবীন্দ্রনাথ, তিনিও হিন্দু ভারতের জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকিয়ে তস্করশ্রেষ্ঠ শিবাজীকে 'বীর মারাঠি' আখ্যায়িত করে তার দীর্ঘ কবিতায় তার যশোগাথা গেয়েছেন।

"হে রাজতপস্বী বীর, তোমার সে উদার ভাবনা/ বিধির ভাণ্ডারে/ সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল প্রভূ তার এক কণা/ পারে হরিবারে?" পর্বত গুহায় লুকিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের সর্বস্ব লুণ্ঠনকারী এক তস্কর, রবীন্দ্রনাথের কলমে 'রাজতপস্বী বীর' আখ্যা পেয়ে গেলেন। শুধু কি তাই, বঙ্গের ত্রাস বর্গী দস্যু শিবাজী ২৭৭ বছর পর রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু মারাঠার নয়, বাঙালী তথা সর্বভারতের নেতার সম্মানেও ভূষিত হলেন। "মারাঠার সাথে আজি হে বাঙালী এক কণ্ঠে বলো/ জয়তু শিবাজী/ সেদিন শুনিনি কথা, আজ মোরা তোমার আদেশ/ শির পাতি লব/কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ/ধ্যানমন্ত্রে তব/ ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরি বসন/দরিদ্রের বল। /এক ধর্ম রাজ্য হবে এ ভারতে এ মহাবচন/ করিব সম্বল।"

রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নে দেখা এক ধর্মরাজ্য এবং শিবাজীর গৈরিক পতাকা হাতে নিয়েই তো আজকের ভারতীয় বিজেপি ভারতে অখন্ড হিন্দুরাজ্য গঠনে তৎপর রয়েছে। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র জীবন্ত ঐতিহ্য হিসেবে ভারতীয়দের কাছে মাতামাতির বিষয় হতে পারে, কিন্তু অধঃপতিত লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, জমিদার বাবুদের লাথির ঘায়ে জর্জরিত পূর্ব বাংলার মুটে, মজুর, ঘাটমঝিদের বংশধর মুসলমান সন্তানদের তিনি গুরুদেব হয়ে বসলেন কিভাবে সেকথা ভাবলেই বিস্মিত হতে হয়। দেখা যায় এক পুরুষের শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানরা গুরুদেব নাম উচচারণ করতে গদগদ হয়ে পড়েন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনুপ্রেরণা।' তিনি জেনে বলেছেন বা না জেনে বলেছেন সে বিষয়ে অনুসন্ধান না করে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ তার সমগ্র জীবনের যে ১২ খানি উপন্যাস লিখেছিলেন, তার মধ্যে তিনটিতে মাত্র মুসলমান চরিত্রের উল্লেখ আছে। সেগুলোও আবার চাকর-বাকর, মুটে-মাঝি, নয়তো লাঠিয়াল-গুণ্ডা। রবীন্দ্রনাথ রচিত ১১টি ছোটগল্পে মুসলমান চরিত্র স্থান পেয়েছে। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে একটিও সম্মানিত চরিত্রের মানুষ নেই। এহেন রবীন্দ্রনাথ কী করে মুসলমানদের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারে সে কথাও বোধে আসে না।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। তাঁর কাছাকাছি সময়ে পৃথিবীতে আরও কয়েকজন প্রতিভাবান লেখক জন্মেছিলেন। যেমন গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২), টলষ্টয় (১৮২৮-১৯১০), বার্ণার্ড শ' (১৮৫৬-১৯৫০), রাসেল (১৮৭২ ১৯৭০) রোমারোঁলা (১৮৬৬-১৯৪৬) তাঁদের কোনো একজনের মতো বহুমুখী দক্ষতা কি রবীন্দ্রনাথের ছিলো? একজন সার্বিকভাবে মহান তখনই

www.pathagar.com

হয়ে উঠেন যখন তাঁর কৃতিত্ব তাঁর প্রতিভা দেশকাল অতিক্রান্ত করে বহুদূর ব্যপ্ত হতে সক্ষম হয়। রবীন্দ্রনাথ যদি বিশ্বকবি হিসেবে পূজিত হন তাহলে হোমার, দাঁন্তে, শেক্সপিয়ারের স্থান বিশ্বে কোথায় হবে? অথচ এটা স্বতঃসিদ্ধ যে কবি হিসেবে, ঔপন্যাসিক হিসেবে, নাট্যকার হিসেবে এই তিনজনের স্থান রবীন্দ্রনাথের অনেক উপরে। কেউ কি হ্যামলেট, ক্লিওপেট্রা, লেডি ম্যাকবেথের মতো কালজয়ী চরিত্র চিত্রণ রবীন্দ্রনাথের লেখায় খুঁজে পাবেন?

তিনি বিশ্বকবি থাকুন তাঁর স্বগোত্রের কাছে। আমাদের কাছে তিনি বড় জোড় হুইটম্যানের মতই শুধু সাধারণ একজন বাংলা ভাষার কবি। বাংলাদেশের মুসলমানদের দৈন্য হলো, তারা সব খুইয়ে দীনহীন, হীনমন্য হয়ে পড়েছে। তাদের আরো সমস্যা হলো, ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে পার্সী, উর্দু, আরবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ফলে তারা রবীন্দ্র জোয়ারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। দেশে আরবী উর্দূ, পার্সী এবং ইংরেজী চর্চা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক সাহিত্য ধারা থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। ফেরদৌসীর শাহনামা'র গভীরতা আমরা পরিমাপ করতে পারি না। পার্সীয়ান কবি হাফিজ, উর্দূকবি গালিবকে আমরা মূল্যায়ন করতে পারি না। এমন চক্ষুহীন অন্ধজনের কাছে রবীন্দ্র প্রতিভা তো হস্তীদর্শনসম মনে হবেই। তাই বলছিলাম, আমাদের সমাজে উচুঁমানের মনীষা ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন বিদ্বান মানুষের অভাব ঘটার ফলে আমরা আবেগ অনুরাগ চালিত রবীন্দ্রভক্ত সাজতে বাধ্য হয়েছি।

জনাব ড. আহমদ শরীফ তাঁর "রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন" প্রবন্ধে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ব্যক্ত-অব্যক্ত, সত্য-মিথ্যা, লঘু-গুরু অনেক অনুযোগ-অভিযোগ রয়েছে। খোঁজও মিলেছে তার রচনার অনেক অপূর্ণতার ও ত্রুটির। সবচেয়ে বড় ক্ষোভ-অভিযোগ এ যুগের পাঠকের, তার বিরূদ্ধে তিনি গণ-মানুষের কল্যাণকামী ছিলেন না, ছিলেন না দেশ-কালানুগ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক জীবনের চাহিদা ও সমস্যা সচেতন।...তার লঘু-গুরু-ত্রুটি-বিচ্যুতি, মন-মননের সীমাবদ্ধতা বিমুগ্ধ-বিমূঢ় ভক্ত-অনুরক্তেরা এতকাল চেপে রেখেছেন। প্রমাণ ষাটের দশকে বুদ্ধদেব বসুকে এবং ইদানিং সুশোভন সরকার ও শুভ ঠাকুরকে অনেক গাল-মন্দ শুনতে হয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথ গুরুদেব থাকুন, কবিগুরু থাকুন, বিশ্বকবি থাকুন তাঁর ভারতবাসীর কাছে, কিন্তু বাংলাদেশের অধঃপতিত মুসলমানদের মুখে যখন গুরুদেব শব্দটা শুনি তখনি রজনী কান্ত সেনের সেই গানটি মনে পড়ে যায়- "যার পাঠশালাতে না পড়ে/ তারে গুরু বলিস কেমন করে?/ কান্ত কয় শুধু মুখের ডাকে/ তোর কোনকালে কি হবে?"

[আয়ার দানিশঃ রবীন্দ্রনাথ কাদের গুরুদেব ঃ কাদের কবিগুরু, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ৩০-১২-৯৮]

www.pathagar.com

১২/০১/৯৯ তারিখের দৈনিক সংগ্রামে জহুরী লিখেছেন,

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক পড়েছেন অনেক জেনেছেন, অনেক লিখেছেন কিন্তু তিনি ইসলামকে জানেননি, জানবার চেষ্টাও করেননি। এ জন্য মুসলমানরা তাঁর সাহিত্যেও আসেনি। তিনি অনেক জাতিকে জেনেছেন, কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমানদের জানার আগ্রহ প্রকাশ করেননি। অথচ তিনিই লিখেছেন, *"বহুদিন ধরে বহুক্রোশ দূরে/ বহু ব্যয় করে বহু দেশ ঘুরে / দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা/ দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু/ দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া /একটি ধানের শীষের উপরে/ একটি শিশির বিন্দু।"* তিনি অনেক দেখেছেন। কিছুই বাদ দেননি, শুধু বাদ দিয়েছেন তারই প্রতিবেশী মুসলমান জাতটাকে।"

হিন্দুরা যে তাদের ধর্মের আবেদন দিন দিন কোন কারণে হারিয়ে ফেলেছে তার উপযুক্ত উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আল্লামা শিবলী নোমানী (রহঃ) একদিন পানি পথে মিসর থেকে হিন্দুস্তান আসতেছেন। হঠাৎ করে তিনি শুনলেন, এই জাহাজেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও আছেন। বাল্যকাল থেকেই উভয়ের মধ্যে চেনাজানা ছিলো। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন, ভক্তবৃন্দ কর্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থায় কবি বসে আছেন। শিবলী নোমানী (রহঃ)-কে দেখে কবি তাড়াতাড়ি উঠে আলিঙ্গন করে তাকে সসম্মানে পাশে বসালেন। কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর শিবলী নোমানী (রহঃ) কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা কবি,তোমাদের ধর্মের আবেদন এত স্তিমিত হয়ে আসছে কেন? মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আর এই ধর্মের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।" একথা শুনে কবি অনেকক্ষণ নীরব থেকে এমন সুন্দর উত্তর দিলেন যা সর্বকালে সর্বযুগে ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কবি বললেন, "নোমানী, যে কোন আদর্শ বা ধর্ম পৃথিবীতে বিস্তার করতে থাকে, দিন দিন মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ঐ ধর্মের বা আদর্শের মধ্যমণির কারনে। যে মধ্যমণির কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে হবে নিষ্কলুষ, কালিমামুক্ত ও সর্ব মানুষের কাছে, সর্বকালে, সর্বদেশে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আফসোস, আমাদের ধর্মের এমন একজন ব্যক্তিত্বও এমন নেই যার আদর্শ সব মানুষের কাছে, সর্বদেশে, সর্বযুগে অনুসরণীয়। এদিক থেকে তোমরা মুসলিমরা ভাগ্যবান, তোমাদের ইসলামের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব এমনই এক অদ্বিতীয় চরিত্রের অধিকারী, তোমাদের মোহাম্মদ (সঃ) এমন এক ব্যক্তিত্ব, যার ব্যক্তিত্ব চিরস্মরণীয়, যার ব্যক্তিত্বে কোনো দাগ নেই।" হিন্দুধর্ম বাতিল ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ এই বাতিল ধর্মের বন্দনা করেছেন, তাই জীবনের শেষে তিনি নিজেই বাতিল হয়ে গেছেন।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ১৩৯-তম জন্মবার্ষিকী গত ৮ই মে ২০০০ জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের (তৎকালীন) প্রধানমন্ত্রী (আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

সভানেত্রী) শেখ হাসিনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উদযাপনের উদ্বোধনী ভাষনে শেখ হাসিনা বলেন, "রবীন্দ্রনাথের দর্শন অবশ্যই বিশ্বশান্তি ও মানবিক বিশ্বের অনুকূল। সে দর্শনকে আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়ে আমাদের সরকারও বাঙালী জাতির উন্নয়ন অগ্রযাত্রা নিশ্চেত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচেছ।... রবীন্দ্রনাথ আমদের আত্মপরিচয়ের এক অনন্ত উৎস। কখনও তাকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না, ত্যাগ করা যায় না। ...রবীন্দ্রমননের সঙ্গে জাতির জনকের জীবন দর্শনের ছিল গভীর সম্পর্ক।" *(দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ৯ই মে ২০০০)*

(সাবেক) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাজ,দেশ ও জাতির কল্যাণে মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথা উল্লেখ করে বলেন, "রবীন্দ্রনাথের কল্যাণবোধ হোক আমাদের পাথেয়। মানুষের কল্যাণকে তিনি দেশের কল্যাণ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে জমিদার হয়েও প্রজার সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক তিনি গড়ে তুলেছিলেন ঈর্ষনীয় ভাবে তা ছিল গনতন্ত্রে বিশ্বাসী আধুনিক কোন রাজনৈতিক নেতার কল্যাণবোধ।..."

রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, "পল্লী উন্নয়নকে তিনি মনে করেছিলেন সত্যিকারের উন্নয়ন। রাজশাহীর পতিসরে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খুইয়ে ছিলেন সঞ্চিত আর্থের পাশাপাশি ধার করা অর্থ । তাতেও তিনি পিছপা হননি। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন দেহের সর্বাঙ্গের সুস্থতাই সুস্বাস্থের সত্যিকারের লক্ষ্য এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসার কোন বিকল্প নেই। এ চেতনা বোধ থেকেই আমাদের সরকার জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে দারিদ্র, নিরক্ষরতা, ক্ষুধা, শোষন ও বঞ্চনার অবসান করে সর্বাঙ্গ সুন্দর এক 'সোনার বাংলা' রূপায়নের গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।..." শেখ হাসিনা রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শের অভিন্নতার কথা স্মরণ করে বলেন, "রবীন্দ্রমননের সঙ্গে জাতির জনকের জীবন দর্শনের ছিল গভীর ঐক্য।" *(দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৯ই মে ২০০০)*

রবীন্দ্রনাথের প্রতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অশেষ ভালবাসার উল্লেখ করে তিনি (শেখ হাসিনা) বলেন, বঙ্গবন্ধু এই নোবেল বিজয়ী মহান কবির জীবন ও সাহিত্যকর্ম থেকে প্রেরণা লাভ করেন। এই প্রেরণা বাঙালী জাতিকে পৃথক স্বাধীন আবাসভূমির জন্য উদ্বুদ্ধ করতে এবং কবির বিখ্যাত 'আমার সোনার বাংলা' জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে মনোনিত করতে উদ্বুদ্ধ করে ।

(দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, ৯ মে ২০০০)

উল্লেখ্য, কোরআন তেলাওয়াত, গীতা, লিপিটক ও বাইবেল পাঠের মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান শুরু হয়।

www.pathagar.com

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭ বৃহস্পতিবার বিকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক জোটভুক্ত সংগঠন 'ঐকতান' টি.এস.সি. চত্বরে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দু'দুদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের সময় 'নজরুল-জয়ন্তী' পালন করা হয় না। তখন শুধু রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরা হয়। জ্যৈষ্ঠমাসে নজরুল জয়ন্তী পালনের সময় রবীন্দ্রনাথকে কেন এতো প্রাধাণ্য দেয়া? রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী শব্দ বিন্যাসে প্রমাণিত হয় আগে রবীন্দ্রনাথ পরে নজরুল অর্থাৎ নজরুল-জয়ন্তীর অনুষ্ঠানের লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ উপলক্ষ নজরুল।'

ফিরোজ মাহাবুব কামাল এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "মুজিবভক্ত বুদ্ধিজীবীরা এ বিশ্বাসে অটল যে, মুজিবচেতনা ও রবীন্দ্রচেতনা এক ও অভিন্ন।" এমন অটল বিশ্বাসের কথাই আওয়ামী সরকারের একজন মন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন। আওয়ামী সরকার রবীন্দ্রচেতনার প্রতিষ্ঠায় যে নিষ্ঠাবান সে ঘোষণাও তিনি দিয়েছেন। ১৯শে মে ১৯৯৮ ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিকে একজন মন্ত্রী বলেন, "বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারলেই রবীন্দ্রনাথের চেতনার বাস্তবায়ন ঘটবে। কারণ সোনার বাংলা গড়ার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি-ভঙ্গী ছিল অভিন্ন।" যারা মুজিবের কাছের লোক মুজিব সম্পর্কে তারা যা জানেন সাধারণ মানুষ তা জানে না। কাছের লোক হওয়ায় মুজিব চেতনার সাথে তাদের নিবিড় পরিচয় থাকাই স্বাভাবিক। কাছে থেকে রবীন্দ্রচেতনার সাথে মুজিবের চেতনার যে অভিন্নতা দেখেছেন তার ভিত্তিতেই তারা এমন বিশ্বাসে অটল হতে পেরেছেন। মন্ত্রী মহোদয় এ বিশ্বাসেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে।

মুজিব ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিলো ভারতীয়দের গুপ্তচর সংস্থার সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট। কথা উঠেছিলো ভারতীয়দের সাথে যোগাযোগ করতে তিনি গোপনে আগরতলাও গিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন তিনি সেটিকে তার বিরুদ্ধ নিছক ষড়যন্ত্র বলেছিলেন। আদালতে বলেছিলেন, তিনি নির্দোষ এবং অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী। অপরদিকে ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের জেলখানা থেকে ফিরে এসে তিনি বলেছিলেন, স্বাধীনতার সংগ্রাম ১৯৭১ সালে নয়, ১৯৪৭ সাল থেকেই শুরু করেছিলেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সিপাহীদের হাতে ধরা দেয়ার পূর্বে তার অনুগতদের বলেছিলেন, ভারত তোমাদের সাহায্য করবে। কলকাতা গিয়ে কাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, সেকথাও তিনি বলেছিলেন (আব্দুর রাজ্জাকের সাক্ষাৎকার) তাই ভারতের সাথে যে যোগাযোগের কথা' ১৯৬৮ সালে তিনি অস্বীকার করেছিলেন তা যে অসত্য ছিলো সে প্রমাণ তিনি নিজেই দিয়েছেন। মুজিবী চেতনার সাথে পরিচয় লাভে এ জন্যই এতই বিভ্রান্তি। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল অবধি মুজিবের কার্যকলাপে এটি সুস্পষ্ট

www.pathagar.com

যে, উক্ত মন্ত্রী অসত্য বলেননি। রবীন্দ্রচেতনা যে মুজিবচেতনার সর্বত্র জুড়ে সেটির প্রমাণ মুজিব নিজেই রেখেছেন। বিষয়টি উক্ত মন্ত্রীর বক্তব্যে যেমন বিমূর্ত তেমনি বিমূর্ত মুজিবের রাজনৈতিক জীবনাদর্শেও। রবীন্দ্রচেতনা তার কতো নিজস্ব ছিলো তার প্রমাণ রেখেছেন রবীন্দ্র সংগীতকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত করে।

প্রশ্ন হলো, কি সে অভিন্ন রবীন্দ্রচেতনা? আমাদের অস্তিত্বের স্বার্থে তার গভীরে যাওয়া প্রয়োজন। খাদ্যের নামে অখাদ্য এবং ওষুধের নামে বিষপান যেখানে অহরহ সেখানে চেতনার নামে অবচেতনার আয়োজন চলছে কি-না সেটিই দেখবার বিষয়। রবীন্দ্রচেতনা ছড়িয়ে আছে তার সমগ্র সাহিত্য জুড়ে। ফলে সে চেতনার সাথে পরিচিতি লাভ অসাধ্য নয়। চেতনাবাহী প্রতিটি মানুষের কর্ম,দর্শন, নীতি, নৈতিকতা ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় তার চেতনা থেকে। চেতনা থেকেই মানুষ পায় রাজনীতির প্রেরণা। নির্ধারিত হয় দেশের ভূগোল। বস্তুত ভৌগলিক মানচিত্র গড়ে উঠার আগে গড়ে উঠে একটি জাতির চেতনার ভূগোল। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে এমন কি মানুষে মানুষে যতো ভিন্নতা তার মূল কারণ চেতনার এ ভিন্নতা। ইসলামী চেতনার আরব আর অনৈসলামী চেতনার আরব ভাষায় ও বর্ণে এক হয়েও এক ছিলেন না। সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন দুটি ভিন্ন চেতনার কারণে। দুই পক্ষের রাজনীতিও ছিলো ভিন্ন, দুই বিপরীত ধারার রাজনীতির কারণে তাদের মাঝে বহুবার যুদ্ধও হয়েছে। ভাষা,বর্ণ, নৃতত্ব বা অভিন্ন ভূখন্ড রাজনীতির নিয়ামক হলে একই ভূগোলের একই ভাষাভাষি মানুষের মাঝে এতো রক্তক্ষয়ের হেতু কি? এদেশে রবীন্দ্রচেতনার জন্ম আজ হয়নি, জন্মেছিলো বাংলাদেশের স্বাধীন ভূগোল সৃষ্টির বহু পূর্বে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, রবীন্দ্রচেতনা বাংলাভাষী মানুষের মূলধারা হলে বাংলাদেশ নিয়ে দুটি ভিন্ন ভূগোলের জন্ম হয় কি করে? বাংলার দুটি পৃথক ভূগোলই কি প্রমাণ করে না যে, বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগণের উপর রবীন্দ্রচেতনার কোনো প্রভাব ছিলোনা? রবীন্দ্রদর্শন প্রথম থেকেই এদেশের মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি, কারণ এটি পরিপুষ্ট হয়েছে বেদ, পুরান, উপনিষদ থেকে। তাছাড়া রবীন্দ্রচেতনায় গুরুত্ব পেয়েছে অখণ্ড ভারত; স্বাধীন বাংলার ধারণাই সেখানে ছিলো না। ছিলো না মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে কোনো ভিন্ন ভূগোল নির্মাণের ভাবনা যেমনটি ভেবেছিলেন ইকবাল। ফলে ইকবাল ভিন্ন ভাষার হলেও আমাদের চেতানার রাজ্যে যতোটা স্থান পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তা পাননি। রবীন্দ্রনাথ স্বভাষি হয়েও চিন্তা চেতনায় বিদেশী ছিলেন। অথচ আমাদের চেতনার মানচিত্রে রবীন্দ্রনাথকে বসানোর জন্য রাষ্ট্রীয় খাত থেকে যতোটা অর্থ ব্যয় হয়েছে ইকবাল কেনো অন্য কোন কবির ক্ষেত্রেই তা হয়নি। রবীন্দ্রচেতনায় আর যাই হোক স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম অকল্পনীয় ছিলো। বস্তুতঃ এদেশে ১৯৪৭ এর সীমানা গড়ে উঠেছিলো রবীন্দ্রচেতনাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই। রবীন্দ্রচেতনায় এদেশের মানুষের

www.pathagar.com

সামান্য বিশ্বাস থাকলে এদেশে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব লাভ হতো অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যে কতোটা অখণ্ড ভারত কেন্দ্রিক ছিলো সেটিই বিমূর্ত হয়েছে তার এ কবিতায়-

"এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন
জীবনে মরণে রব শপথ বন্ধন
ভারত মাতার তারে সঁপিনু এ প্রাণ
সাক্ষী পূণ্য তরবারী, সাক্ষী ভগবান।"

অর্থাৎ ভগবানকে সাক্ষী রেখে রবীন্দ্রচেতনা অখণ্ড ভারত মাতায় সমর্পিত হয়েছিলো। এখানে ভারত আছে, ভগবান আছে সর্বোপরি ভারতমাতার কাছে আত্মসমর্পণ আছে কিন্তু এতে স্বাধীন বাংলাদেশের কোনো ধারণা আছে কি? অখণ্ড ভারতের প্রতি অঙ্গীকারে রবীন্দ্রচেতনা অতিশয় আপোষহীন, এজন্যেই তার গান ভারতের জাতীয় সংগীত। জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে একটি জাতি তার স্বতন্ত্র ভূগোলের যুক্তি খুঁজে পায়। পায় আত্মত্যাগের প্রেরণা। রবীন্দ্র সঙ্গীতে ভারতীয়রা সে যুক্তিই শুধু পায় না, বরং তার গানে অখণ্ড ভারত বন্দনার ভাষাও খুঁজে পায়। রবীন্দ্র রচিত ভারতের জাতীয় সংগীতটি হলো ঃ

"জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্যাহিমাচল যমুনা গঙ্গা-উচছল জলধি তরঙ্গ।..."

রবীন্দ্রনাথ এখানে জয়ধ্বনী করেছেন ভারতের বিধাতার, বাংলার স্বাধীন অস্তিত্বের সামান্য ধারণাও এখানে নেই। এখানে পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা প্রভৃতি আবাঙ্গালীর সাথে এক দেহে লীন হওয়ার প্রেরণা আছে; কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে বেড়ে উঠার আহবান নাই। এ গানের ছত্রে ছত্রে বিমূর্ত হয়েছে অখণ্ড ভারতের রাজনৈতিক চেতনা। যে রবীন্দ্র মানস নিবেদিত ছিলো ভারত ভাগ্য বিধাতার চরণতলে সে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বলার প্রেরণা আসে কি করে? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"হে মোর চিত্ত পূণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

ভারত মাতার তীর্থে রবীন্দ্রনাথ তার চিত্তকে সমর্পণ করে আনন্দ খুঁজেছেন। আনন্দ পেয়েছেনও। আনন্দের অতিশয্যে 'বন্দে মাতরম' বলে জয়ধ্বনিও করেছেন। তিনি গেয়েছেনঃ

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্রটি জীবন
বন্দে মাতরম।"

www.pathagar.com

বিজেপি চেতনা আর রবীন্দ্রনাথের চেতনা এখানে একাকার। ভারত মাতার তীর্থে এ চেতনা সকল ভারতবাসীকে বন্দে মাতরমের দীক্ষা নিতে বলে। কিন্তু বিপদ শুধু এখানেই নয়। আমাদের জন্য অতিশয় ভাবনার বিষয় হলো এ রবীন্দ্রচেতনাই অভিন্ন মুজিবচেতনা। এটি শুধু মুজিব ভক্তরাই বলেন না, নিজ জীবদ্দশায় মুজিব তার স্বাক্ষরও রেখে গেছেন। এ অভিন্ন চেতনার কারণেই মুজিব রবীন্দ্র সঙ্গীতকে করেছেন "জাতীয় সঙ্গীত"। আজ যদি রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতেন আর ভারত যদি আমাদের উপর হামলা করতো তাবে রীন্দ্রনাথ কোন দেশের পক্ষ নিতেন? যিনি ঢাকা কেন্দ্রিক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতায় রাস্তায় নামতে পারেন তিনি ঢাকা কেন্দ্রিক স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে থাকতেন এটি আমরা কি করে ভাবতে পারি? ভারতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অঙ্গীকার কতো গভীর তা কি "সঁপিয়াছি সহস্র জীবন বন্দে মাতরম" এ চরণটিতে পরিস্ফুট নয়? অথচ কবিরা মরেন না, তারা বেঁচে থাকেন তাদের সাহিত্য কর্ম নিয়ে। অর্থাৎ বেঁচে থাকা কবি রবীন্দ্রনাথ ও তার চেতনা আজ আমাদের কোন দিকে পথ দেখায় সেটিও কি আমরা বুঝিনা? প্রশ্ন হলো অখণ্ড ভারতের প্রতি আত্মসমর্পিত এ চেতনা নিয়ে কেউ কি বাংলাদেশের অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারেন? অথচ রবীন্দ্রনাথকে আমরা তাই বানিয়েছি। জাতির সামনে এভাবেই এমন এক মডেল যিনি মাথা "সঁপিয়াছি" বলে নিজেই ভারত বন্দনায় সমর্পিত।

মাথা টানলে যেমন কাণ আসে তেমনি রবীন্দ্রচেতনা টানলে মুজিবচেতনাও আসে। কারণ এ দুটো তো অভিন্ন। যে কোন মুজিব ভক্তের মতো উক্ত মন্ত্রী সেটাই বলেছেন। মুজিব নিজেও তারই সাক্ষ্য রেখে গেছেন। একাত্তরের পরে ভারতীয় লুটপাটের যে সয়লাব শুরু হয় তার বিরুদ্ধে মুজিব মুখ খুলেননি। ভারতের চরণতলে সঁপে দেয়া রবীন্দ্রচেতনার কারণেই। কারণ, অনুগত মন নিয়ে মনিবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়া যায় না। মুজিববাদীরা তাই পারেননি। বিনা প্রতিবাদে ২৫ সালা গোলামী চুক্তি স্বাক্ষরের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছিল এভাবেই।

রবীন্দ্রনাথ নিছক কবি ছিলেন না। তাঁর একটি রাজনৈতিক দর্শনও ছিলো। সে দর্শন নিয়ে তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছেন। বিরোধিতায় নেমেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধেও এবং এটিই হলো রবীন্দ্রচেতনার ইতিহাস। এ চেতনা সেদিকেই হাতছানি দিচ্ছে। এ চেতনার কারণেই তিনি 'জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা' বা সঁপিয়াছি সহস্র জীবন 'বন্দে মাতরম' এর গান গেয়েছেন। অথচ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তির পক্ষে এমন গান গাওয়া শুধু অসম্ভবই নয়, অকল্পনীয়ও। যেমন অকল্পনীয় অখন্ড ভারতে বিশ্বাসী হয়ে বাংলাদেশের পৃথক পতাকা ও মানচিত্রে বিশ্বাসী হওয়া। রবীন্দ্রনাথও তাই হতে পারেননি। প্রতিটি বিশ্বাস বা চেতনাই অবিভাজ্য। ধর্মে মুসলমান হয়ে রাজনীতিতে হিন্দু, ইহুদী বা ধর্মহীন হওয়া যায় না। তেমনি অবিভাজ্য রবীন্দ্র চেতনাও । তাই

www.pathagar.com

রবীন্দ্রচেতনায় বিশ্বাসী হয়ে 'জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা'র ভারত মুখিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াটা অসম্ভব। এদেশে যারা রবীন্দ্র চর্চাকে এবাদত মনে করেন তাদের ভারত মুখিতা এজন্যই এতটা প্রকট। ১৯৪৭-এ যে স্বাধীনতা আসে তাকে তারা এ কারণেই স্বাধীনতা মানতে চায়না। কারণ সেটি এসেছিল ভারত বিভক্তির মধ্য দিয়ে। এমন ভারত বিভক্তিতে রবীন্দ্রচেতনা বোধগম্য কারণেই আহত হয়েছিলো, তাই সেটিকে তারা জায়েজ ভাবেননি। বরং ইতিহাসের চাকাকে তারা উল্টোদিকে ঘোরাতে চান। ১৯৪৭ থেকে আমরা যতোটা সামনে এগিয়েছি সেটুকু তারা পিছিয়ে নিতে চান। '৭১-এ তারা সে কাজ শুরু করলেও শেষ করতে পারেননি। অধ্যাপক আবু সাইয়ীদ সেটির উপরই জোর দিয়েছেন। এটিকেই তারা বলেছেন একাত্তরের চেতনা। শেখ মুজিব রবীন্দ্র সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত করেছেন। ধর্ম শিক্ষাকে কমিয়ে রবীন্দ্র চর্চাকে তিনিই অবাধ করেছেন। ভারতের সাথে ২৫ সালা চুক্তি করেছেন, সীমান্ত খুলে দিয়েছেন এবং লুটপাটের অবাধ অধিকারও দিয়েছেন। এরপরও দেশের স্বতন্ত্র পতাকা ও মানচিত্র টিকে আছে। এখন বলছেন, রবীন্দ্রচেতনার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি। তবে কি এখন বিলুপ্ত হবে স্বতন্ত্র পতাকা ও মানচিত্রখানিও? এবং ভারতীয়দের সাথে অভিন্ন সুরে গাওয়া হবে 'জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা'? রবীন্দ্র সাহিত্যের চর্চা এ দেশে কম হয়নি। এখন কি তার রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে এগুতে হবে? কিন্তু তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের কি হবে? অভিন্ন রবীন্দ্র ও মুজিব চেতনার নামে এদেশে 'জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা' গাইলে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ গাইবে কে? এতে কি বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবে না? বাংলাদেশের স্বাধীন অস্বিত্বের প্রতি ভয়ানক বিপদের আশংকা তো এখানেই।

এ প্রসঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবনে গোলাম সামাদ ১৪ই নভেম্বর ১৯৯৮ দৈনিক ইনকিলাবের উপসম্পাদকীয় কলামে লিখেছেনঃ

"সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ হয়তো অনেকের কাছে প্রিয়। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দানকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয় কারো পক্ষে। কিন্তু তা বলে বর্তমানে অনেকে যেমন দাবী করছেন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় চেতনার উৎস তা মনে করবার কোনো সংগত কারণ আছে বলে মনে হয়না। কারণ রবীন্দ্রনাথ এক অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু আমরা তা দেখিনা। বাংলাদেশের মানুষ লড়াই করেছে একটা পৃথক রাষ্ট্রের জন্য। ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন পৃথক বাংলাদেশ গড়বার স্বপ্ন দেখেননি। তিনি তার গীতাঞ্জলীর বিখ্যাত ভারততীর্থ কবিতায় লিখেছেন ঃ

"হে মোর চিত্ত, পূণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে/ এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে/ হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে/ উদার ছন্দে পরমানান্দে

www.pathagar.com

বন্দনা করি তারে/ ধ্যান গম্ভীর এই যে ভূধর, নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর/ হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে/ এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।"

এর মধ্যে বাংলাদেশ কোথায়? রবীন্দ্রনাথ কোনদিন পৃথক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গড়বার স্বপ্ন দেখেননি। কিন্তু তবু এখন একদল লোক প্রচার করতে ব্যস্ত, রবীন্দ্রনাথ নাকি আমদের জাতীয় চেতনার উৎস। অথচ রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে সামান্য কিছু পরিচয় থাকলেই বোঝা যায়, এই প্রচার কতদূর মিথ্যা। শুধু তাই নয়, রবীদ্রনাথ আগাগোড়া দেখেছেন অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন। এমন কি তিনি ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দীকেই সমর্থন দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, মারাঠা নেতা শিবাজী চেয়েছিলেন সমগ্র ভারতকে এক ধর্মারাজ্য পাশে বাঁধতে। তাই শিবাজী ছিলেন মহান। রবীন্দ্রনাথ তার 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় আক্ষেপ করেছেন, বলেছেন, শিবাজীর ডাক যদি বাংলাদেশে এসে পৌঁছত তবে এক অখণ্ড ভারত গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তা হয়নি।...

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত কবিতার বক্তব্য আর যাই হোক নিশ্চয়ই কোন প্রকার বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে সমর্থন যোগায় না। কারণ, শিবাজী ছিলেন মারাঠি, বাঙ্গালী নন। অথচ ১৯৭১ সাল থেকে আজ পযর্ন্ত একাধিক বুদ্ধিজীবী প্রমাণ করতে চাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ হলেন বাঙালী জাতীয়তাবাদের উৎস। আর আজকের বাংলাদেশ রবীন্দ্রভাবধারার উপর অধিষ্ঠিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন একটি লেখা থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেছেন। বাংলা ভাষাকে প্রকর্ষ দিয়েছেন। এ বিষয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে না। কিন্তু তিনিই হলেন বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় চেতনার উৎস, এ রকম সংবাদ প্রচারে যুক্তি কোথায়? পশ্চিম বঙ্গে রবীন্দ্রর্চচা এখনও হয় বাংলাদেশের চাইতে অনেক বেশী। রবীন্দ্র সঙ্গীত এখনও পশ্চিম বঙ্গেই গীত হয় অধিক এবং সুন্দরভাবে। কিন্তু তাই বলে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা-ভাষীরা একটা পৃথক রাষ্ট্র গড়তে চাচ্ছে না। যদি চাইতেন তবে বলা চলত, রবীনন্দ্রনাথ বাঙালী জাতীয়তাবাদের উৎস। কিন্তু আসাম স্বাধীনতা চাচ্ছে অথচ পশ্চিমবঙ্গ থাকতে চাচ্ছে ভারতের সঙ্গেই যুক্ত। রবীন্দ্রনাথ তাদের স্বাধীন হতে প্রেরণা দিচ্ছেন না। পশ্চিমবঙ্গে মানুষ হিন্দী শিখছে। চাচ্ছে বিশেষ ভাবেই ভারতীয় হতে। তাদের আর আমাদের জাত্যাভিমান এক নয়। তাই বলতে হয়, আজকের পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয় চেতনার উৎস রবীন্দ্রনাথ নন, অন্য কিছু। সেজন্যই অন্য কিছু নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দিয়ে কোন ব্যাখ্যা পেতে চাওয়া একেবারেই অবান্তর। বিচার অযোগ্য ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথের এক জন্মবার্ষিকীতে আওয়ামী লীগের অন্যতম নেত্রী সাজেদা চৌধুরী বলেছিলেন, আওয়ামী লীগের ধর্মনিরেপেক্ষতার উৎসও নাকি রবীন্দ্রনাথ। সাজেদা চৌধুরী রবীন্দ্রদর্শন সম্পর্কে কতোটা জানেন তা জানি না। রবীন্দ্রনাথ

www.pathagar.com

কোনদিনই নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবী করেননি। বরং গেয়েছেন অখণ্ড ভারত গড়ে উঠার বেদ-উপনিষদের চিন্তাকে নির্ভর করে। সেটা নিশ্চয়ই ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সাজেদা চৌধুরীর মতে ঃ "আওয়ামী লীগের ধর্ম নিরপেক্ষতার উৎস কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেতনার ফসল। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের মানুষের মনে রবির মতো। সেই আলোয় আমরা পথ দেখি। ..."আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দর্শন যে কি পরিমাণ বিভ্রান্তিকর তা তার এই বিশেষ নেত্রীর উক্তি থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। এই রবীন্দ্রপূজার শেষ কোথায়? কোন পথে পরিচালিত করতে চাচ্ছে আওয়ামী লীগ আমাদের জাতীয় চেতনাকে? অনেকে বলেন, বাংলাভাষার প্রথম জাতীয় চেতনার বাণী প্রচার করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ নন। অথচ এদেশে মধুসূদনকে নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের তেমন কোন চিন্তা-ভাবনা করতে দেখা যায় না। জাতীয় চেতনা গড়বার ক্ষেত্রে ভাষার বুনিয়াদ গড়বার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চাইতে মধুসূদনের অবদান কোন অংশে কম নয়। মধুসূদনের নাটকের সংলাপের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই আধুনিক চলতি গদ্যের উৎস। মধুসূদন হিন্দুধর্ম ছেড়ে খৃস্টান ধর্ম গ্রহন করেছিলেন, কিন্তু ধর্ম নিয়ে কোন মাতামাতি করবার প্রয়োজন অনুভব করেননি। কার্যক্ষেত্রে তার চিন্তা-চেতনা থেকেছে অনেক সেক্যুলার। তিনি হিন্দুর সমাজজীবন থেকে মুসলমানের সমাজজীবনকে ভেবেছেন অনেক পরিচছন্ন। লিখেছেন "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো"-এর মত নাটক।

বাঙালী জাতীয়তাবাদকে নির্ভর করে কবিতা লিখেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তার দু'টি কবিতা পশ্চিমবঙ্গের স্কুলের পাঠ্যক্রম থেকে সরকারীভাবে বাদ দেয়া হয়েছে। এ বাদ দেবার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এ দুটি কবিতা নাকি প্রাদেশিকতার পরিপোষক। ভারতীয় চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী। আমরা জানি ধর্মচিন্তার দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবেই উদার। মুসলিম ভাবধারা তার কবিতায় স্থান পেয়েছে। যা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পায়নি। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতা-নেত্রীদের কাছে রবীন্দ্রনাথই হলেন সকল বিচারে বড়। তিনিই হলেন আমাদের সকল জাতীয় চেতনার উৎস। এই রবি রশ্মিতেই আমরা দেখে চলেছি আমাদের মুক্তির পথ। একই সভায় কবির চৌধুরী সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে সাজেদা চৌধূরীর মতো বললেন, "বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস হলেন রবীন্দ্রনাথ।" সাজেদা চৌধুরীর সাহিত্যজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই। শুনেছি কবীর চৌধুরী সাহেব এক সময় নাকি ছিলেন ইংরাজি ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপক। তাঁর সাহিত্য অনুভব তাই গভীর হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তিনি কি জানেন না, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আধুনিক গবেষণার ফলাফল । রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পের

www.pathagar.com

জন্য প্রখ্যাত। কিন্তু তাঁর বহু ছোট গল্পই বিদেশী গল্পের অনুকরণ। যেমন তাঁর বিখ্যাত ছোট গল্প 'ক্ষুধিতপাষাণ' বিখ্যাত আমেরিকান ছোট গল্প লেখক এডগার এলান পো'র 'Under the Ragged Mountains' ও বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক তোয়াফিল গেতিয়ের 'ল্যা পিয়ে দ্য লা মমে' নামক গল্পের উপর ভিত্তি করে রচিত। রবীন্দ্রনাথের বহু ছোটগল্পই বিদেশী ছোটগল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত। এমন কি অনুকরণ বললেও চলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন জায়গায় এ ঋনের কথা স্বীকার করবার প্রয়োজন দেখেননি। অনেকে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবকে এখন কঠোর ভাষায় বলেছেন, এক ধরণের সাহিত্যিক চৌর্যবৃত্তি মাত্র। রবীন্দ্র গবেষক প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস-এর মতে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস 'যোগাযোগ'-এর অনেক অংশ গলজ ওয়ার্দির লেখা The Forsyte saga-এর থেকে নেয়া। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা নিয়েছেন যথেষ্ট সুকৌশলে। বিস্তারিত বিশ্লেষণ না করলে যা ধরা পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে লিখেছেন প্রচুর। কিন্তু এই বিচিত্র সাহিত্য সম্ভারের একটা বড় অংশই হলো সাহিত্যিক 'চুরি'। আমি সাহিত্যের লোক নই। কিন্তু এসব কথা যখন বিজ্ঞ সমালোচকদের বলতে শুনি, তখন ভাবি, রবীন্দ্রনাথ কতটুকু মৌলিক। যদি তিনি মৌলিক না হন, তবে তাকে নিয়ে এত মাতামাতি করবার যৌক্তিকতা কোথায়? কিন্তু তবু কবীর চৌধুরীদের মত সাহিত্য রসিকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এক অতুলণীয় সাহিত্য প্রতিভা । বিশ্ব সাহিত্যে তার তুলনা মেলে না। সব চিন্তা শেষে যেয়ে মেশে রবীন্দ্রনাথে।পূজা করো রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি এক। আমাদের জতিসত্তা তিনিই গড়ে দিয়েছেন।

এক সময় এদেশ ইংরেজের অধীন ছিল। ইংরেজের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য একদল স্বাধীনতাকামী বেছে নিয়েছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ। রবীন্দ্রনাথ তার 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে এদের চরিত্র এঁকেছেন খুবই নোংরাভাবে।

'চারঅধ্যায়' উপন্যাস সে সময় বিক্রি হয়েছিল যথেষ্ট। এর একটি কারণ হলো, রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাস কিনে সে সময় ইংরেজ সরকার জেলে রাজবন্দীদের পড়তে দিতো। যাতে তাঁরা আর বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম না করে। এ সব কথা এখন জানা যাচেছ, ইংরেজ আমলের গোপন সরকারী কাগজপত্র থেকে। শরৎচন্দ্র তাঁর 'পথের দাবী' নামক উপন্যাস লেখেন তখনকার স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করে। ইংরেজ সরকার তার এই বইটিকে বাজেয়াপ্ত করে। রবীন্দ্রনাথ এ সময় মন্তব্য করেন, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী উপন্যাস লেখা উচিৎ হয়নি। সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে অন্যায় করেনি। এমনই ছিল ইংরেজ আমলে রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের চেহারা।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ এক পর্যায়ে সর্বপ্রকার জাতীয়তাবাদেরই নিন্দা করেছেন। ইংরেজিতে লেখা তাঁর একটা প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

I am not against one nation in perticular. but against general idea of all nations (Tagore Nationalism)| রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সর্বপ্রকার জাতীয়তা মানুষের মনকে সংকীর্ণ করে তোলে। সর্বপ্রকার জাতীয়তাবাদ বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি স্বরূপ। তাই শান্তির স্বার্থে বর্জন করা উচিত সর্ব প্রকার জাতীয়তাবাদকেই।

জানি না, কবির চৌধুরীরা রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাসূত্রকে গ্রহণ করে বলতে আরম্ভ করবেন কি না, বিশ্ব শান্তির জন্য বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদও পরিত্যাজ্য। বাংলাদেশের উচিত হবে না সেনাবাহিনী রাখা। দেশের সীমান্ত অবারিত করে দেয়া উচিত সবার জন্য।

যতদূর মনে পড়ছে, একবার কবীর চৌধুরী কলকাতার এক সভায় বলেছিলেন, "১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়া ছিল ভুল।" জানি না কবীর সাহেবরা এখন এই ভুল শুধরাবার চেষ্টায় লিপ্ত কি না। তবে আমরা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি ঃ পাকিস্তান হয়েছিল বলেই আমাদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছে । ভারতে বাংলাভাষার কোন ভবিষ্যৎ নেই। কারন হিন্দিই সেখানে করতে যাচ্ছে একচ্ছত্র রাজত্ব। রবীন্দ্র সাহিত্য তাই টিকে থাকলে থাকবে বাংলাদেশেই।

{এবনে গোলাম সামাদ ঃ উপসম্পাদকীয় ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৪/১১/৯৮}

ইদনিং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আওয়ামীরা আদা-জল খেয়ে লেগেছে। তারা বলতে চান, আমাদের চেতনা, আদর্শ, মূল্যবোধ, আত্মপরিচয় সবকিছুর উৎস রবীন্দ্রনাথ। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা তাকে ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যা দিয়ে বস্তুত রবীন্দ্রনাথের প্রতি চরম অবিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যা ছিলেন না তাকে তা বলে চিহ্নিত করার অর্থই হলো রবীন্দ্রনাথের অবমূল্যায়ন করা। যে কবি সারা ভারতে এক ধর্মরাজ্য (রাম রাজ্য) প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। তাকে ধর্মনিরপেক্ষ বানাবার জন্য আবোল-তাবোল উক্তি ঝাড়া নিতান্তই হাস্যকর।

"রবীন্দ্রনাথের দেখানো আলোয় আমরা পথ চলি।" যিনি বলেছেন তিনি ও তাঁর অনুসারীরা হয়তো সে পথে চলেন। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ সে পথে চলে না। কারণ, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, চেতনা আর মুল্যবোধের সাথে আমাদের তথা মুসলমানদের বিশ্বাস, চেতনা আর মূল্যোবোধ সম্পর্ক সাংঘর্ষিক। সকলের উচিত মতলববাজ নেপথ্যচারীদের অসত্য ভাষণ সম্পর্কে সজাগ থাকা।

www.pathagar.com

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতোটাই রবীন্দ্রপ্রেমে উদ্ভ্রান্ত যে বলে ফেললেন, রবীন্দ্রনাথ নাকি বাংলাদেশের জন্য জাতীয় সঙ্গীত লিখেছিলেন। এটা শেখ হাসিনার অজ্ঞতা না আদিখ্যেতা তা আমাদের জানা নেই। তবে এ কথা সুস্পষ্ট যে, শেখ হাসিনা না বুঝলেও একজন দুগ্ধপোষ্য শিশুও বোঝে যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত লেখেননি বা লিখতে পারেন না। স্থানকাল পাত্র ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকেই তা পারা যায় না। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠি যেটাকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত করেন। সেই "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" সঙ্গীতটি রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ রচনা করেছিলেন পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশের অস্তিত্ব মুছে ফেলার জন্য। রবীন্দ্রনাথ যে বাংলাকে ভালবাসার কথা বলেছেন, সেটা আজকের বাংলাদেশ নয়, বরং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা মিলে তার স্বপ্নের যে অখণ্ড বাংলা, সেই বাংলা। অতএব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত লেখেননি, লিখেছিলেন অখণ্ড বাংলা রাজ্যের পরিচিতি সঙ্গীত।

কথায় বলে, 'যার শেষ ভালো তার সব ভালো'। রবীন্দ্রনাথের শেষটা মোটেই ভালো ছিল না। ইসলামে বলে, 'কর্মফলের শাস্তি মৃত্যুর পূর্বে এই পৃথিবীতে সামান্য একটু দেয়া হয়, কবরে (আলমে বরজখ) একটু বেশী এবং আখিরাতে সর্ব্বোচ্চ শাস্তি।' রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পুর্বে অহেতুক সেই কষ্ট ভোগ করেছিলেন। শেষটুকু আল্লাহর হাতে। হিন্দুধর্ম বাতিল ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ এই বাতিল ধর্মের বন্দনা করেছেন, তাই জীবনের শেষে তিনি নিজেই বাতিল হয়ে গেছেন। হিন্দু রবীন্দ্রনাথ শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত 'ছলনাময়ী'কেই আশ্রয় করেছিলেন। তাই শেষ জীবন ছলনার মধ্যেই কাটলো। আল্লাহর নিকট বাতিল হওয়ায় বিশ্বকবির বিশ্বব্যাপী সম্মান হওয়া সত্বেও জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো চরম অসম্মানের মধ্যে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত শারদীয় শনিবারের চিঠি ১৩৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত বিশ্বভারতীয় অধ্যাপক ড. অমিতাভ চৌধূরী রচিত 'রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?' শীর্ষক বেদনাদায়ক প্রতিবেদনটির অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো ঃ

"মহাপুরুষদের পরিণত বয়সে মৃত্যুও অকাল মৃত্যু। যেমন রবীন্দ্রনাথ। রূপরসে সৃষ্টিকর্মে আশি বছরের পরিপূর্ণ জীবন তাঁর, কিন্তু জ্বরা তাঁকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারেনি। জ্ঞান হারাবার আগে পর্যন্ত মন ছিল ক্রিয়াশীল। ১৯৪১ সালের ৩০শে জুলাই সকাল ৯টায় অপারেশন টেবিলে যাবার আগেও কবিতা লিখেছেন, *'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনা ছলে হে ছলনাময়ী'*। কবিতাটি তিনি মুখে মুখে বলে যান, লেখেন রানীচন্দ্র। তাঁকে বলেন, "কিছু গোলমাল আছে, পরে ঠিক করব খন।"

www.pathagar.com

"কিন্তু তাঁর শেষ রচনা সংশোধন করার সুযোগ দিলেন না ডাক্তার ও আত্মীয়-স্বজনরা। তাঁর অনিচ্ছায় অপারেশন করিয়ে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছেন ঘনিষ্ঠ জনেরা। এমন অনিন্দসুন্দর দেহকান্তি, প্রশান্ত মুখমণ্ডল পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে ঠোঁটের ও চোখের কোণে চরম বিরক্তি নিয়ে। এই ধরনের একজন যুগন্ধর পুরুষকে চিকিৎসার নামে ছেলেখেলা অমার্জনীয় অপরাধ। আমি যদি বলি, যে সাবধানতা নেয়া উচিত ছিল, তা করা হয়নি বলে এবং রোগীর ইচ্ছাকে ফুঁৎকারে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল বলে প্রচণ্ড যন্ত্রনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন সমাপ্ত করে দেয়া হয়েছে, তাহলে অত্যুক্তি হবে না। সেদিন যা ঘটেছিল তা হত্যারই নামান্তর।"

প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন অস্ত্রোপাচারের বদলে তাঁর কবিরাজী চিকিৎসা হোক। কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থের চিকিৎসায় তিনি ফলও পাচ্ছিলেন। কিন্তু বারবার দোনামনা করে শেষ মেষ ঠেলে দেয়া হয় ছুরি কাঁচির কাটাকাটির টেবিলে । দ্বিতীয়তঃ সেকালের সবেচয়ে বড় ডাক্তার নীলরতন সরকার চাননি অপারেশন হোক। তবু ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের জবরদস্তিতে নীলরতন সরকারকে সরে যেতে হয়। তৃতীয়তঃ কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথের স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা এবং প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের পরামর্শের উপর বারবার নির্ভর করে গোটা ব্যাপারটাকেও আরও জটিল করে তোলে। চতুর্থতঃ অপারেশনের ব্যবস্থা কোন ভাল হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে না করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর বারান্দায় করে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়া হয়েছে। উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা না নেয়ায় সেপটিক হয়ে তিনি মারা যান। পঞ্চমতঃ এনাস্থেশিয়ার ভাল ব্যবস্থা না হওয়ায় কবিকে অপারেশনের সব যন্ত্রণা সজ্ঞানে সহ্য করতে হয়। ষষ্ঠতঃ অপারেশনের পর কোন ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্স না রেখে ঘনিষ্ঠজনদের উপর সেবার ভার দেয়া রবীন্দ্রনাথের ক্ষতির কারণ হয়েছে।

"রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসা হলো জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। কবে অপারেশন হবে রবীন্দ্রনাথকে জানানো হয়নি। ৩০ শে জুলাই সকালে রানীচন্দ্রকে নতুন কবিতা ডিকটেশন দিচেছন, হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে এলেন ডা. ললিত ব্যানার্জী। এসেই বললেন, এক্ষুণি অপারেশন হবে। রবীন্দ্রনাথ চমকে গেলেন।"

"ষ্টেচারে করে বারান্দায় আনা হল তাঁকে। প্রষ্টেট কাটা নয়, তল পেটে একটু জায়গায় ফুটো করে ইউরিন বেরুনের রাস্তা করে দেয়া। ডাক্তারী শাস্ত্রে যাকে বলে সুপ্রাপিউরিক সিস্টেস্কপি। লোকাল এনেস্থেসিয়া দিতে পঁচিশ মিনিট লাগলো। রবীন্দ্রনাথ সব টের পেলেন। ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করলেন চোখ বুঁজে। ৩রা আগষ্ট থেকে অবস্থার অবনতি হলো। ৫ই আগষ্ট থেকে জ্ঞান ছিলো না। ৭ই আগষ্ট মারা গেলেন। হলো সেপটিক, হলো ইউরেনিয়া। বাড়ীর বারান্দায় ভাল প্রতিষেধক ছাড়া অপারেশন করলে এমনিই তো হবে। কোন ভাল নার্সিং হোমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া

www.pathagar.com

হয়নি কেন? তাহলে এত কষ্টের মধ্যে তাঁকে বিদায় নিতে হতো না। প্রথমে চিকিৎসা বিভ্রাট, পরে অবিবেচনার, অযত্ন, আশ্চর্য।"

কলকাতায় কতো ভালো হাসপাতাল, নার্সিং হোম ছিলো, বিশ্বকবির এমন দুর্ভাগ্য, অতি সাধারণ শ্রেণীর রোগীও এগুলোর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে আর হয়নি। অজ্ঞান না করে সজ্ঞানে অপারেশন করা যে কতো যন্ত্রণাদায়ক তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই টের পান। হেলাফেলার অপারেশনের ফলে সেপটিক হয়ে গেলো। পচন ক্রমাগত সম্প্রসারিত হতে লাগলো। ৩রা আগস্ট থেকে অবস্থার অবনতি হলো। ৫ই আগস্ট থেকে জ্ঞান ছিলো না। ৭ই আগস্ট ১৯৪১ মোতাবেক ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ বেলা ১২টা ১০ মিনিটে মারা গেলেন। মৃত্যুর পর আরও বীভৎস হয়ে দেখা দিলো পরিস্থিতি। অধ্যাপক ড: অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেনঃ

"মৃত্যু তো হলো, তারপর আরও অবিবেচনা। রবীন্দ্রনাথের ইচছার প্রতি আবার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন।রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর যেন শোক মিছিলে কোন উদ্দামতা না হয়। আমার নামে কোন জয় ধ্বনি যেন না দেয়া হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললে কি হবে, তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রবীন্দ্রনাথের শব দেহকে ছেড়ে দিলেন বিশৃঙ্খল জনতার হাতে। রথীন্দ্রনাথ দিশেহারা হয়ে অন্য ঘরে নিক্রান্ত, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বরানগরে জ্বরে শয্যাশায়ী, ডাক্তাররা সব নিজেদের বাড়ীতে, শান্তিনিকেতনে কেউ গান গাইছেন, মালা গাঁথছেন, শেষ শয্যা বানাচ্ছেন, মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার খাট বানাচ্ছেন, কাঁদছেন, আর ততক্ষনে ঠাকুর বাড়ীর কলাসিবল গেট ভেঙ্গে জনতা মহর্ষি ভবনে ঢুকে টেনে-হিঁচড়ে দেহ নিয়ে চলে গেল জনস্রোতের মাঝখানে।"

"সেখানে কেউ তাঁকে বহন করার ছিল না। আর অমন সুন্দর শরীর নিমতলার দিকে ভেসে চলল এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে। সেই সঙ্গে মুর্হুমুহু ধ্বনি "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে কি জয়", "বন্দে মাতরম" ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য ভাল, তার দেহ ঠেলাঠেলিতে মাটিতে পড়ে যায়নি। পড়লে নিমতলায় নিয়ে যাওয়ার আগে কলকাতার রাস্তায় পদলিত হয়ে কবরস্থ হতে হতো। বিশ্বভারতী বা কলকাতার এমন কেউ ছিল না যে, জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে একটু সুশৃংখল শোক মিছিল করেন। আরও দুর্ভাগ্যের কথা, একমাত্র জীবিত পুত্র রথীন্দ্রনাথ মুখাগ্নি পর্যন্ত করতে পারেননি, বাড়ীতেই মুহ্যমান হয়ে শুয়েছিলেন। সম্পর্কিত এক নাতি কলকাতার দিকে নিমতালার ঘাটে যেতে না পেরে হাওড়ায় গিয়ে ওপার থেকে নৌকা করে এ পারের ঘাটে আসেন এবং কোনমতে মুখাগ্নি করেন। যখন মুখাগ্নি করা হয় তখন রবীন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল বিকৃত। জনতার এতই রবি অনুরাগ যে, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তার মাথার চুল ও মুখের দাড়িসহ উপড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

www.pathagar.com

"এই হল কবি প্রয়াণের শেষ দৃশ্য। সারা জীবন সুন্দরের সাধক রবীন্দ্রনাথকে বিদায় নিতে হলো অসুন্দরের হাতে। তাঁর নিকটজনেরা যদি অপারেশন না করতেন, তাহলে আরও কিছুদিন বাঁচতেন তিনি। আমরা আরও কিছু অসাধারণ রচনা পেতাম--অন্তত কিছু গান ও কবিতা । কিন্তু তা হতে দেয়া হল না। তারপর সিদ্ধান্তহীনতায় বন্দী হয়ে বিশ্বভারতী ও ঠাকুর বাড়ীর লোকেরা তাঁকে ঠেলে দিলেন উচ্ছৃখংল জনতার মাঝখানে।"

[অমিতাভ চৌধুরী ঃ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? ঃ শারদীয়া শনিবারের চিঠি, ১৩৯২, কলিকাতা।]

কি মর্মান্তিক পরিণতি, বিশ্বকবির কতো নামডাক অথচ তার অপারেশন হলো কিনা এনেস্থেসিয়া ছাড়াই, সজ্ঞানে, কল্পনাতীত যন্ত্রণা দিয়ে, আর পরে তা সেপটিক হয়ে মারা গেলেন। ড. অমিতাভ চৌধুরী প্রশ্ন করেছেন, "ভাল নার্সিং হোমে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি কেন? তাহলে এত কষ্টের মধ্যে তাকে বিদায় নিতে হতো না।"

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ কবিতা লিখলেন, *"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছো আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনা ছলে ছলনাময়ী।"* তাই ছলনাময়ী (মা কালী) তাঁর সাথে শুধু ছলনা করে গেলো। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেও তিনি নিস্তার পেলেন না। ড. অমিতাভ লিখেছেন, "ঠাকুর বাড়ীর কোলাপসিবল গেট ভেঙ্গে জনতা মহর্ষি ভবনে ঢুকে টেনে-হিঁচড়ে দেহ নিয়ে চলে গেল জনস্রোতের মাঝখানে। সেখানে কেউ তাকে বহন করার ছিল না"

জমিদার রবীন্দ্রনাথের জীবনের শুরু ছিলো খুবই সুখের, সারা জীবনও সুখেই কাটালেন, কিন্তু শেষ পরিণতি দুঃখের ও গ্লানির। চেহারা পর্যন্ত এমন বিকৃত ও বীভৎস হয়ে পড়েছিল যে, তাঁকে দেখে সবাই আঁৎকে উঠেছিলো। রবীন্দ্রনাথের কি সুন্দর চুল দাড়ি সব তার ভক্তের দল উপড়ে ফেলেছিলো তার স্মৃতি ধরে রাখবে বলে। চুল-দাড়ি বিহীন রবীন্দ্রনাথ কতোখানি কদাকার হতে পারেন অনুমান করা য়ায়। সুন্দরের সাধকের শেষে এই পরিণতি। ছলনাময়ীর ছলনার আর কি প্রমাণ চাই! ইসলামে ছলনা বলে কিছু নেই। ড. অমিতাভ আক্ষেপ করে লিখেছেন, "সারা জীবন সুন্দরের সাধক রবীন্দ্রনাথের চির বিদায় নিতে হল অসুন্দরের হাতে।" আল্লাহর নিকট বাতিল বলেই রবীন্দ্রনাথের শেষ পরিণতি চরম ব্যর্থতায় ভরা। এই চরম মুসলিমবিদ্বেষী পৌত্তলিকের সংস্কৃতির উত্তিরাধিকারী আমরা হই কিভাবে? আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন কোনো মুসলমান কখনো এ দাবী করতে পারে না। তৌহিদবাদীরা রবীন্দ্র সংস্কৃতি প্রত্যাখান করে বলবে, 'আমরা মহান নজরুল সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী'।

আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা দেশের স্বাধীনতাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেতনার ফসল। রবীন্দ্রনাথের দেখানো

www.pathagar.com

আলোয় তারা পথ দেখেন। আল্লাহর দেখানো নয়, রবীন্দ্রনাথের দেখানো পথে চলার জন্য আহবান জানাচ্ছেন তারা। তাদের আত্মপরিচয়ের অনন্ত উৎসও রবীন্দ্রনাথ। কোরআন-হাদীস নয়। পুত্রের হাতে মুখাগ্নি হয়নি রবীন্দ্রনাথের কতোবড় হতভাগ্য।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উল্লেখিত উক্তির সঙ্গে আমরা যদি একাত্মতা প্রকাশ করি, রবীন্দ্রনাথ যদি সত্য সত্যই আমাদের আত্ম পরিচয়ের এক অনন্ত উৎস হন, তাহলে নির্দ্বিধায় বলতেই হয় যে, প্রথমতঃ আমরা সবাই হিন্দু কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীও এই প্রকার উক্তি করতে দ্বিধা করেন নাই যে, মুসলমান ধর্মে ইসলামানুসারী হলেও জাতিতেও তারা হিন্দু। দ্বিতীয়তঃ আমরা শিবাজী পূজারী যে শিবাজীর বর্গী লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তদল লুট-তরাজ , অগ্নি-সংযোগ ও নারীহরণ করে বাংলাকে ছারখার করে দিয়েছিলো। অর্থাৎ আমরা শিবাজীর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তৃতীয়তঃ আমরা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিরোধী, কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমকে নিয়ে একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হোক কিংবা ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি বৃহৎ ভূ-ভাগে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হোক এটা হিন্দু রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ রদের আড়ালে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি তথা বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছিলেন। চতুর্থতঃ আমারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধী, কারণ ১৯১২ সালের ২৮শে মার্চ কলকাতার গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় তার সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পঞ্চমতঃ আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার খোলসে প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে বিতাড়ন করতে চাই, কারণ ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথ বেদ-উপনিষদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সনাতন হিন্দু ধর্মকে তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন, হিন্দু সমাজ ব্যতীত প্রতিবেশী মুসলিম সমাজ সম্পর্কে তাঁর দু'চোখ বন্ধ রেখেছেন। বরং তাঁর সাহিত্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করেছেন।

আমরা কি আসলেই তা চাই কিংবা চাইতে পারি, যেমনটা আজীবন রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন? অন্য ধর্ম, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সভ্যতার প্রতি এতোটুকু শ্রদ্ধাবোধ না করে যিনি *'এক ধর্মরাজ্য নামে খন্ড বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'* বলে দৃঢ় চিত্তে *'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে* এ মহাবচন করিব সম্বল', করে যিনি কাব্য সাধনা করেছেন, 'যবন নিধন' ও 'এক ধর্মরাজ্যে'র নামে যিনি সমগ্র ভারতে অখণ্ড রামরাজত্ব কায়েমের স্বপ্ন দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই স্বপ্নের প্রতি ইংগিত করেই হয়তো বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের সাথে জাতির জনকের জীবন দর্শনের ছিল গভীর সম্পর্ক।" *(জনকণ্ঠ, ৯মে ২০০০)* "রবীন্দ্রনাথের কল্যাণবোধ হোক আমাদের পাথেয়।" *(ইনকিলাব ৯ই*

www.pathagar.com

মে) প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন "রবীন্দ্রনাথ রাজশাহীর পতিসরে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।" *(যুগান্তর ৯ই মে ২০০০)*, কিন্তু তিনি বলেননি যে, "রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে ৮ টাকা সুদে টাকা ধার করে নিয়ে পতিসরের কৃষকদের ধার দিতেন ১২ টাকা সুদে।" *(এবনে গোলাম সামাদ)*।

ভাবতে অবাক লাগে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মতো জনপ্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তি কি করে বলতে পারেন যে, "রবীন্দ্রনাথ আমাদের আত্মপরিচয়ের এক অনন্ত উৎস।" তিনি নামায পড়েন, রোযা রাখেন, হজ্জ করেছেন, ওমরাহ করেছেন, মদীনা শরীফ জিয়ারত করেছেন। প্রশ্ন জাগে তিনি মক্কা ও মদীনা কার কাছে যেতেন? মদীনাতে যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমিয়ে আছেন, তিনি তবে কে? তিনি কি তাঁর আত্মপরিচয়ের উৎস নন? তাহলে মদীনা শরীফে উনি কার কাছে যান? রবীন্দ্রনাথের রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করলে হয়তো তার হারাবার কিছু নেই। কারণ তাঁর ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনীরা এমনকি তার একমাত্র বোনও বিদেশে বসতি স্থাপন করেছেন। তারা সম্ভবত আর কখনও দেশে ফিরবেন না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানরা হারাবে তাদের অস্তিত্ব আর স্বকীয়তা। একজন আমলদার মুসলমানের আত্মপরিচয়ের উৎস তো কোরআন ও হাদীস। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বা তার দল আওয়ামী লীগের হয়তো আত্মপরিচয়ের ঘাটতি খুঁজে পেতে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হতে হয়, কিন্তু বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় মুসলমান যারা আল্লাহর বান্দা ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত তাদের আত্মপরিচয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হতে হবে না কখনও। কারণ বিদায় হজ্বের ভাষণে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের আত্মপরিচয়ের দুটি উৎসের কথা বলে গেছেন। আরও বলেছেন, সেই উৎস দুটো আঁকড়ে ধরে থাকলে আমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবো না। তার একটি আল্লাহর বাণী আল কোরআন এবং অপরটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বা হাদীস।

আর আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিনা ঐ উৎসের মধ্যে ঘাটতি (নাউযুবিল্লাহ) খুঁজে পেলেন, তা পূরণের জন্য তাকে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হতে হলো। কি ভয়াবহ! আবু রুশদ-এর ভাষায় ঃ "যদি কেউ কাউকে সমর্থন করেন তাহলে তিনি বা তারা তিনটি উপায়ে তা করতে পারেন। এর একটি হলো সচেতনভাবে অর্থাৎ সব জেনে বুঝে সমর্থন জোগানো। দ্বিতীয়টি হল অবচেতনভাবে অর্থাৎ কিছুই না বুঝে বোকার মত "জ্বী হুজুর" বলা। আজন্ম আবেগপ্রবণ অনেক বাংলাদেশীও

www.pathagar.com

উভয়ভাবেই আধিপত্যাবাদের প্রতি সমর্থন জুগিয়ে এসেছে ও আসছে। ১লা বৈশাখের দিনে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী মাথায় সিঁদুর পরে মহাশান্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তরুণীরা তরুণ বন্ধুদের কপালে চন্দনের তিলক পরিয়ে দিচ্ছে। এদের সবাই যে বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী তাও কিন্তু নয়। ভারতের গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, মাহারাষ্ট্র, তামিলাড়ু, হিমাচল এ রকম সব প্রদেশের হিন্দু মেয়েরা মাথায় সিঁদুর দেয়। ওদের কি তাহলে বাঙালী বলতে হবে? এরা অবচেতনভাবে মাথায় সিঁদুর লাগিয়ে মনে করেছে এটা তো নিছক বাঙালী সংস্কৃতি ভিন্ন কিছু নয়। অনেক ধার্মিক পরিবার যেখানে মা-বাবা হয়তো পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ছেন, হজ্জও করে এসেছেন, সেখানে তাদেরই সন্তান অনুসরণ করছে পৌত্তলিক সংস্কৃতি। এরা পারিবারকভাবে ঈদের দিন নামাজ পড়ে, শবে বরাতের রাতে হৈ হুল্লোর করে, বিয়ের সময় কালেমাও উচচারণ করে, আবার বিয়ের দিনে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে বেদাতের আশ্রয় নেয় নিশ্চিন্তে। এরা ধর্মের অনুষ্ঠানও মানছে, আবার সাংস্কৃতিক পর্যায়ের পৌত্তলিক দর্শনেরও অনুরক্ত হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ এটার একটু, ওটার একটু, এই আর কি? সবদিকেই আছে। এমন কন্ট্রাডিকশন তো ইসলামে নেই।

বহু বিষয়ে ডক্টরেটধারী শেখ হাসিনার এবং তার দলের শুভবোধ যতো দ্রুত জাগ্রত হবে ততোই মঙ্গল। কারণ আমরা কেউ অমর নই। মৃত্যু অনিবার্য। আর মৃত্যুর পর আছে হয় বেহেশত না হয় দোজখ। ছোট বড় সবকাজ সম্পর্কে পরকালে জবাবদিহি করতে হবেই। এ জীবনটা আমরা যেভাবে কাটাবো তারই ফল ভোগ করতে হবে পরকালে। সুতরাং ব্যাপারটা মোটেই অবহেলার নয়। দুনিয়ার জীবনে যদি ভুল পথে চলতে থাকি তাহলে পরকালে সুফল পাওয়ার আশা করা বোকামী।

সুতরাং কোন সচেতন মুসলমান ঐ তথাকথিত বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না এবং ঐ জাতীয় সংগঠনে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে না। পরিশেষে আল্লাহর কাছ আশ্রয় চাই যেন এই সংকটময় বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে কোরআন ও হাদীসকেই আমাদের তথা বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় মুসলমানদের আত্মপরিচয়ের একমাত্র উৎস হিসেবে মানার তওফিক এনায়েত করেন। আমীন!

- o -

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স